দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

‘হিন্দ কী হিম্মত’
গুরু
গোবিন্দ সিংহ
পৃঃ - ১৪

অর্থনীতি নিয়ে
ভারতের
যুগান্তকারী
পরীক্ষা-নিরীক্ষা
পৃঃ - ২৭

৬৯ বর্ষ, ২০ সংখ্যা।। ২৩ জানুয়ারি ২০১৭।। ৯ মাঘ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

৩৫০তম জন্মবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

গুরু গোবিন্দ সিংহ

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ২০ সংখ্যা, ৯ মাঘ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

২৩ জানুয়ারি - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ■ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ■ ৬-৯

হিংসার নয়া রাজনীতি চালু করলেন মুখ্যমন্ত্রী
■ গূঢ়পুরুষ ■ ১০

খোলা চিঠি : বনবাসে গেলেন রামচন্দ্র, রেখে গেলেন আত্মাকে ■ সুন্দর মৌলিক ■ ১১

হবু 'পশ্চিম বাংলাদেশ' থেকে একটি প্রতিবেদন
■ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ■ ১২

'হিন্দ কী হিম্মত' গুরুগোবিন্দ সিংহ
■ তরুণ বিজয় ■ ১৪

ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্রশক্তির মূর্ত বিগ্রহ গুরুগোবিন্দ সিংহ
■ সর্দার গুরুচরণ সিংহ গিল ■ ১৬

'সরবংশী দানী' গুরুগোবিন্দ সিংহ
■ প্রকাশ সিংহ অটল ■ ১৮

খালসাপন্থ প্রতিষ্ঠাতা গুরুগোবিন্দ সিংহ
■ সর্দার চিরঞ্জীব সিংহ ■ ১৯

স্যমন্তক থেকে কোহিনূর ■ সন্দীপ চক্রবর্তী ■ ২১

অর্থনীতি নিয়ে ভারতের যুগান্তকারী পরীক্ষা-নিরীক্ষা
■ শ্যাম সুন্দর ■ ২৭

ক্যাশলেস একটি নগদ ছাড়া লেনদেন ব্যবস্থা
■ ধর্মানন্দ দেব ■ ২৯

নেত্রীর মাত্রাছাড়া আস্ফালনই তৃণমূলকে ডোবাবে
■ একলব্য রায় ■ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ■ **অঙ্গনা : ২৬** ■
অন্যরকম : ৩৩ ■ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫-৩৬** ■ **চিঠিপত্র : ৩৭-৩৮**
■ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৯**■ **শব্দরূপ : ৪০** ■
চিত্রকথা : ৪১ ■ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

প্রকাশিত হবে ৩০ জানুয়ারি ২০১৭

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৩০ জানুয়ারি ২০১৭

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সাধারণতন্ত্র সংখ্যা

স্বাধীনতার ৭০ বছর পেরিয়ে আসার পর এদেশে সাধারণতন্ত্র কতটা প্রতিষ্ঠিত হলো— এই নিয়ে এবারে চর্চা করেছেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত, অমলেশ মিশ্র প্রমুখ।

দাম একই থাকছে : ১০ টাকা

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

রোজভ্যালি ঃ কেন্দ্রের বিরোধিতা নিরর্থক

চিটফান্ডের দুর্নীতি লইয়া পশ্চিমবঙ্গ গত বেশ কয়েক বৎসর ধরিয়া অস্বস্তির মধ্য দিয়া চলিয়াছে। চিটফান্ড দুর্নীতি এক ভয়ংকর ব্যাপার। কেননা এই দুর্নীতির ফলে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন সাধারণ মানুষ। তাঁহাদের মধ্যে কিছু হতদরিদ্র মানুষ আক্ষরিক অর্থেই সর্বস্বান্ত হইয়াছেন। অতএব এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করাটাই কাম্য। অভিযোগ হইল, দুই শতাধিক অসাধু চিটফান্ডের কারবার রক্ষার ঠিকা কিছু রাজনীতির কারবারি লইয়াছেন। সেইগুলির মধ্যে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য হইল রোজভ্যালি। বাংলার রাজনীতি এখন যাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নামে চিটফান্ড দুর্নীতির বিশেষত রোজভ্যালির দুর্নীতির সহিত যুক্ত থাকিবার বিস্তর অভিযোগ রহিয়াছে।

আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী রোজভ্যালি চিটফান্ড কাণ্ড লইয়া কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়াছেন। তাঁহার অভিযোগ কেন্দ্র সরকারের বিমা কোম্পানি এল আই সি রোজভ্যালির সঙ্গে যুক্ত। কেন্দ্র সরকারের পরোক্ষ নির্দেশেই সি বি আই রোজভ্যালির সঙ্গে যুক্ত তৃণমূল সাংসদ তাপস পালকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তৃণমূলের অপর এক সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যান্য দলের সহিত নোট বাতিলের বিরোধিতা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে—নেত্রীর এমনই অভিযোগ। তাঁহার যুক্তি, এল আই সি কেন্দ্রীর সরকারের অর্থমন্ত্রকের অধীনে কাজ করিয়া থাকে। কয়েকটি বিষয়ে রোজভ্যালির সহিত এল আই সি-র চুক্তি হইয়াছে। এই বিষয়ে তাই তদন্ত এবং সেইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর গ্রেফতারের দাবি তিনি জানাইয়াছেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে, রোজভ্যালির সহিত চুক্তি হইয়াছে আগেই—নরেন্দ্র মোদী সরকারের আমলে নহে, তাই মোদী বা জেটলি এই বিষয়ে কীভাবে দায়ী হইলেন?

এইকথা ঠিক যে রোজভ্যালির সহিত এল আই সি ব্যবসায়িক চুক্তিতে আবদ্ধ। কিন্তু ঘটনা হইল রোজভ্যালি নিজেদের ব্যবসার স্বার্থে এল আই সি-র নাম ব্যবহার করিয়াছে। এল আই সি-র রোজভ্যালির নাম ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন হয় নাই। এল আই সি-র সঙ্গে চুক্তির পরে পরেই রোজভ্যালি এল আই সি-র নাম ব্যবহার করিয়াছে। প্রচার করিয়াছে যে এল আই সি-সহ অন্যান্য আর্থিক ব্যবসার সঙ্গে রোজভ্যালি যুক্ত—একই সঙ্গে কাজ করিতেছে। একটি চিটফান্ড কোম্পানির উপর মানুষের আস্থা তখনই বাড়িয়া যাইবে যখন দেখা যাইবে ওই কোম্পানির সহিত শাসকদলের নেতা-নেত্রীরা যুক্ত। সিবিআই-এর জিজ্ঞাসাবাদের পর এই অভিযোগ পুষ্ট হইয়াছে যে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাপস পালের সহিত রোজভ্যালির লেনদেন ছিল। রোজভ্যালির সহিত এল আই সির-র যে ব্যবসায়িক চুক্তির কথা উঠিয়াছে তাহা কোনও বেআইনি নহে। নিয়ম অনুযায়ী দুইটি কোম্পানির মধ্যে এমন চুক্তি হইতেই পারে। ইহার অর্থ এই নয় যে একটি কোম্পানি নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে অন্য কোম্পানির নাম ভাঙাইয়া কাজ করিবে। রোজভ্যালি এই বেআইনি কাজটিই করিয়াছে। এইজন্য রোজভ্যালি ও ইহার দুর্নীতির সহিত যুক্ত ব্যক্তিদেরই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলিয়া কোনও লাভ নাই।

সুভাষিতম্

কামধেনুগুণা বিদ্যা হ্যকালে ফলদায়িনী।
প্রবাসে মাতৃসদৃসী বিদ্যা গুপ্তং ধনং স্মৃতম্।। (চাণক্য নীতি)

বিদ্যা অসময়েও ফল দান করে তাই তা কামধেনুর সমান। বিদেশে বিদ্যা মাতৃতুল্য। তাই পণ্ডিতরা তাকে গোপন সম্পদ বলে মনে করেন।

সব বাধা জয় করে সঙ্ঘের কার্যক্রম ব্রিগেডে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মকর সংক্রান্তির দিন কয়েকটি মোক্ষম পৌরাণিক উদাহরণ টেনে আনলেন তিনি। প্রথমত, ভগীরথের পরিশ্রম এবং সেই পরিশ্রমের ফলস্বরূপ গঙ্গোদ্ধার। দ্বিতীয়ত, গঙ্গাকে নিজের জটায় ধারণ করার শিবের ক্ষমতা এবং তৃতীয়ত, শিবকে প্রসন্ন করার জন্য তপস্যা। তিনি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের কাছে পরম পূজনীয় এবং অসংখ্য দেশভক্তের গভীর শ্রদ্ধার মানুষ সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পশ্চাদ্‌বর্তী অংশে নিরন্তর সংগ্রামের সাফল্যে আয়োজিত মকর-সংক্রান্তি উপলক্ষে রাজনৈতিক ও বায়বিক ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে গঙ্গা ভগীরথের পৌরাণিক উদাহরণ টেনে এনে মোদ্দা কথাটা বুঝিয়ে দিলেন—এক, স্বয়ংসেবকদের পরিশ্রমী হতে হবে। দুই, বৃহত্তর হিন্দু সমাজকে কথায় ও কাজে নিজের বুকে ধারণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে এবং তিন, তার জন্য তপস্যা করতে হবে।

মকর-সংক্রান্তির বার্তায় স্পষ্ট করে তিনি বলেন, আমরা অন্ধকার থেকে সূর্যালোকে প্রবেশ করতে চলেছি। আর এস এসের কার্যকর্তাদের ক্রিয়াশক্তির ওপরই যে এই প্রবেশে অধিকার জন্মাবে তাও স্পষ্ট করে দেন তিনি। সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, 'বিশ্বের সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় পরমবৈভবশালী ভারতবর্ষ গড়ে তোলা। এর জন্য হিন্দুসমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও গুণসম্পন্ন হতে হবে। বাধা সত্ত্বেও কঠোর পরিশ্রম করে শুদ্ধপ্রেরণা নিয়ে এগোলে সাফল্য আসে। আজকাল সবেতেই বাঁধা। বাধার মধ্য দিয়ে কাজ করেই আনন্দ। ভারত-মাকে বিনম্র

শ্রদ্ধা জানিয়ে এই মনোভাব রাখতে হবে—আর কিছু চাই না। মা, সব তোমার জন্য।' ডা. হেডগেওয়ার যখন সঙ্ঘ শুরু করেছিলেন তখন তাঁর না ছিল লোকবল, না ছিল অর্থবল। কিন্তু তবুও তিনি পেরেছিলেন। ডা. হেডগেওয়ার বলতেন, হিন্দু সমাজের দুর্দশার জন্য আমরাই দায়ী। মোগল শক্তি কিংবা ব্রিটিশ শক্তির দিকে আঙুল তোলার আগে নিজের দিকে আঙুল তোলা উচিত। আমাদের পরাজয় আমাদের দুর্বলতারই পরিণাম। আমাদের সেই শক্তি অর্জন করতে হবে, যাতে আমাদের দিকে বাঁকা চোখ তাকাবার সাহস কারোর না হয়। ডা. হেডগেওয়ারের লেটার হেডে সবসময় তিনটি কথা লেখা থাকতো—'ক্রিয়া সিদ্ধি শক্তি ভবতি।' কাজ করতে হবে, সিদ্ধির জন্য তপস্যা করতে হবে। তবেই আমরা হিন্দুরাষ্ট্রকে পরমবৈভবসম্পন্ন করার শক্তি অর্জন করতে পারবো।' প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে হিন্দু সমাজকে এগোনোর পথ করে নিতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। —এই পরিস্থিতির জন্য একে-ওকে দায়ী করার কোনও অর্থ নেই। হিন্দুদের নিজেদের সংগঠিত হতে হবে। তবেই শক্তি বাড়বে। যার শক্তি আছে, তাকেই সবাই নমস্তে বলে। যার শক্তি নেই, তাকে যে যা খুশি করতে পারে।

বিবেকানন্দের উদাহরণ টেনে এনে তিনি বলেন যে স্বামীজী বলেছিলেন দুর্বলতাই মৃত্যু, শক্তিই জীবন। দুর্বলকে কেউ সমীহ করে না। হিন্দুদের শৌর্য ও বীর্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে তিনি শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের কথাও উল্লেখ করেন। যিনি খালসা শক্তিকে ধর্মরক্ষায় ভৌগোলিক ও সামাজিকভাবে একত্রীকরণ করেছিলেন। তাঁর জন্মের সাড়ে তিনশো বছর পূর্তির উৎসব ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়ে গিয়েছে। একইভাবে সরসঙ্ঘচালক তাঁর বক্তব্যে আনেন রামানুজাচার্যের প্রসঙ্গ। যাঁর এবার জন্মসহস্রবর্ষ। হিন্দু সমাজে রামানুজাচার্যের সাংগঠনিক মন্ত্র দেওয়ার এবং জাতিভেদ লোপের অবদানের কথা স্মরণ করাবার পাশাপাশি আচার্য অভিনব গুপ্তের সাংগঠনিক শক্তির কথাও মনে করিয়ে দেন মোহনজী। আর এই প্রসঙ্গে তাঁর ভাষণে সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ। তিনি বলেন, এই মহাপুরুষদের আদর্শ করেই হিন্দু সমাজকে সংগঠিত হতে হবে, নির্ভয় হতে হবে, শক্তি সম্পন্ন হতে হবে। তাহলেই দূর হয়ে যাবে সব সংকট।

শ্রীভাগবত তাঁর বক্তব্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর (শ্রী গুরুজীর) কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আর এস এস প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন নয়। তাই সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা ভারতবর্ষে সর্বযুগে সর্বকালেই দরকারি। কারণ চরম সত্য হলো ভারতবর্ষকে উন্নত করতে হলে শক্তিশালী সংগঠন প্রয়োজন। হিন্দুত্বকে আধার করেই সেই সংগঠন গড়ে উঠবে। তিনি এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করে বলেন, হিন্দুত্বের আদর্শ কোনো সংকীর্ণ বিচারধারা নয়। সুপ্রিম কোর্টও তাদের এই বক্তব্যে অনড় থেকেছে। বিশাল ভারতবর্ষে প্রত্যেক মানুষের উপাসনা পদ্ধতি স্বতন্ত্র হতেই পারে, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই সনাতন ধর্মের যা হিন্দু নামে পরিচিত, সবাই তার অঙ্গীভূত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি।

একইসঙ্গে তিনি স্বয়ংসেবকদের স্মরণ করিয়ে দেন আত্মতুষ্ঠিতে ভুগলে চলবে না। ভারতবর্ষকে বৈভবশালী করতে গেলে

সাধনা দরকার, সংকল্প দরকার। তিনি বিবেকানন্দের মহাবাণী 'বিশ্বের প্রতিটি কোণে থাকা হিন্দুকে নিজের বলে যখন ভাবতে পারবে কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদবাচ্য হবে' স্মরণ করিয়ে স্বয়ংসেবকদের আহ্বান করেন— মকর-সংক্রান্তির দিনই সংকল্প নিয়ে পৌঁছে যেতে হবে সমাজের ঘরে ঘরে। সঙ্ঘের শাখায় জুড়তে হবে বন্ধুদের। ভারতবর্ষের অতীত গৌরব-গাথা, ভারতপ্রেমের গান শুনিয়ে তাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সংগঠন বাড়াতে হবে। দিনের নির্দিষ্ট কিছু সময় সমাজের কাজে দিতে হবে। তাহলেই পবিত্র ও শক্তিশালী হিন্দুসমাজ তথা পরমবৈভবসম্পন্ন ভারতবর্ষ গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে মোহনজী তাঁর মত ব্যক্ত করেন।

প্রসঙ্গত, কলকাতা মহানগরের স্বয়ংসেবকদের কথা মাথায় রেখেই মকর সংক্রান্তির এই কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে রাজ্য প্রশাসন এই কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটতে থাকে। ইতিমধ্যে স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তাদের উৎসাহের মাত্রার কারণে বিগ্রেডে সভা করার জন্য সেনা অনুমতি মিললেও পুলিশ অনুমতি দেয়নি। এরজন্য কলকাতা পুলিশকে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর এজলাসে তীব্র ভৎসর্নার মুখে পড়তে হয়। বহু টালবাহানার পর নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে বিগ্রেডে এই কার্যক্রম আয়োজনের অনুমতি পাওয়া যায়। অবশ্য জেলায় জেলায় শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে মোহনজীর বক্তব্যের সরাসরি সম্প্রচার কোথাও টিভির মাধ্যমে কোথাও জায়ান্ট স্ক্রিন লাগিয়ে তা দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন স্বয়ংসেবকরা।

(ছবিগুলি তুলেছেন স্বপন কুমার পাল)

সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযোগ জানালে শাস্তি : সেনাপ্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। যেসব জওয়ান অভাব-অভিযোগ জানানোর জন্য সোশ্যাল মিডিয়াকে বেছে নিচ্ছেন তাদের নিরস্ত করার প্রয়াস শুরু করল সেনাবাহিনী। সম্প্রতি সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ না করে সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযোগ জানালে শাস্তি পেতে হবে বলে জওয়ানদের সাবধান করে দিয়েছেন। দিল্লি ক্যান্টনমেন্টে অনুষ্ঠিত বাহিনীর

দিল্লি ক্যান্টনমেন্টে সেনাবাহিনীর প্যারেডে বক্তব্য রাখছেন সেনাপ্রধান।

প্যারেডে উপস্থিত সেনাপ্রধান বলেন, 'আমাদের কয়েকজন বন্ধু তাদের অভাব-অভিযোগ জানানোর জন্য সোশ্যাল মিডিয়াকে বেছে নিয়েছেন। এই ধরনের কাজ সীমান্তে মোতায়েন জওয়ানদের মনে কুপ্রভাব ফেলে। .....আমি জানিয়ে দিতে চাই যারা এসব করছেন, এখনই তা থেকে বিরত না হলে তাদের বিরুদ্ধে কঠিনতম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হতে পারে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে দুজন জওয়ান সেনা-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিপিন রাওয়াত বলেন, 'যদি কোনও জওয়ান কোনও বিষয়ে অভিযোগ করতে চান তাহলে তার জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। জওয়ানরা সেই পদ্ধতি অনুসরণ করুন এবং বাহিনীর ভারসাম্য বজায় রাখুন। নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করেও যদি ফল না পান তাহলে আমার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করুন।' এদিন সেনাপ্রধান একটি নতুন পরিষেবা চালু করেন যার মাধ্যমে একজন জওয়ান যে কোনও অভিযোগ তাঁকে সরাসরি জানাতে পারবেন। বলা বাহুল্য, এই ধরনের ব্যবস্থা পূর্ববর্তী কোনও সরকার গ্রহণ করেনি। তিনি বলেন অভিযোগকারীর নাম এই ব্যবস্থায় গোপন থাকবে।

অন্য একটি প্রসঙ্গে বিপিন রাওয়াত জানান, গত কয়েকমাসে কাশ্মীরে জঙ্গিদের ক্রিয়াকলাপ বেড়ে গেছে। তিনি বলেন, এল আই সি (লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল) হোক বা এল ও সি (লাইন অব কন্ট্রোল), আমরা সর্বত্র সঠিক ব্যবস্থা নিয়েছি। আমাদের জওয়ানরা বীরের মতো লড়াই করেছে। এই প্রসঙ্গে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, সীমান্তে আমরা শান্তি চাই। কিন্তু তার মানে এই নয় আক্রান্ত হলে আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব।

মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষেরা যাতে আরও বেশি সংখ্যায় অংশ নিতে পারেন, তার জন্য দেশের মুসলমান-প্রধান ১০,০০০ অঞ্চলে মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ বিশেষ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এই খবর দিয়ে মঞ্চের আহ্বায়ক ম হম্মদ আজাল এবং সাংগঠনিক প্রধান গিরিশ জুয়াল বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি মুসলমানদের শুধু ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করেছে। যার ফলে স্বাধীনতা এবং সাধারণতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপনের মতো জাতীয় অনুষ্ঠানে মুসলমানদের অংশগ্রহণ এখনও প্রত্যাশিত মাত্রায় পৌঁছায়নি। মঞ্চ এই কর্মসূচীতে মাদ্রাসা, মসজিদ এবং ইসলামি পাঠক্রমের স্কুলগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর ডিসেম্বরে আগ্রায় অনুষ্ঠিত মঞ্চের বৈঠকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। গত বছর স্বাধীনতা দিবসেও নাগপুরের বোহ্‌রা মাদ্রাসায় মঞ্চের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ইন্দ্রেশকুমার মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।

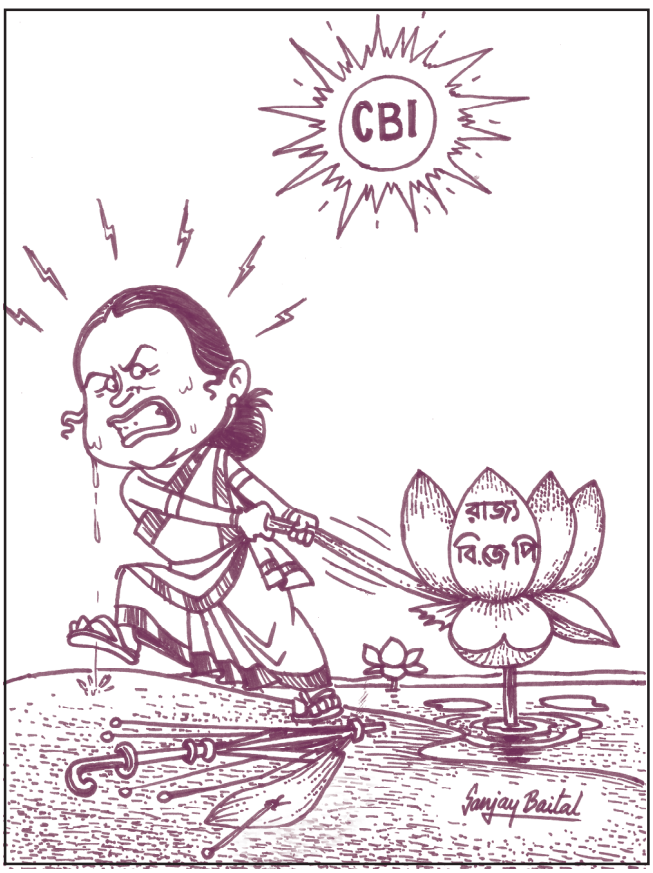

উবাচ

“কিছু সঙ্গী নিজের সমস্যার কথা বলতে গিয়ে সোস্যাল মিডিয়ার সাহায্য নিচ্ছেন। এর প্রভাব বাহাদুর জওয়ানদের উপর পড়ে, যাঁরা সীমান্তে কর্মরত রয়েছেন।”

জেনারেল বিপিন রাওয়াত
ভারতের সেনাপ্রধান

জওয়ানদের সোস্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা প্রসঙ্গে।

“কংগ্রেস নেতাদের বাস্তববাদী হওয়া দরকার। কেরলের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের বয়স ৩০-এর নীচে। ৬৫ শতাংশ চল্লিশের নীচে। যে দলে নেতারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে সেই দলের উপর যুবকদের কোনো আস্থা থাকে না।”

এ কে অ্যান্টনি
কংগ্রেস নেতা

কেরলে কংগ্রেস নেতাদের পারস্পরিক বিবাদ প্রসঙ্গে।

“আমাজন, ভদ্র ব্যবহার করুন।”

শক্তিকান্ত দাস
কেন্দ্রীয় অর্থ সচিব

জুতার উপর ভারতীয় মনীষীর ছবি ব্যবহার প্রসঙ্গে।

“এটা সুপ্রিম কোর্ট না পাড়ার রক?”

জে এস কেহর
প্রধান বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্ট

জনস্বার্থে দায়ের করা মামলার নিষ্পত্তিতে রাজ্যগুলির উদাসীন মনোভাব প্রসঙ্গে।

“দেশের নামে অপমানজনক কথা বলা সু-শিক্ষার পরিচয় নয়।”

মনোহর পারিকর
কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

শিক্ষার সঙ্গে দেশপ্রেমের সম্পর্ক প্রসঙ্গে।

হিংসার নয়া রাজনীতি চালু করলেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিহিংসার রাজনীতি কাকে বলে তা রাজ্যের শাসকদলের নেত্রীর কাছে শিখতে হয়। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারের পরেই নেত্রী হুংকার দিয়েছিলেন যে রাজ্যের বিজেপি নেতাদের আমার পুলিশ বাড়ি থেকে তুলে আনবে। নেত্রীর অভিযোগ, নোটবন্দির প্রতিবাদ করার জন্যই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সি বি আই সুদীপবাবুকে গ্রেপ্তার করেছে। সুদীপবাবু ধোয়া তুলসীপাতা। তৃণমূলের সাংসদ কুণাল ঘোষ, প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী মদন মিত্রকে সি বি আই যখন গ্রেপ্তার করে তখন দেশে নোটবন্দি হয়নি। সারদাকাণ্ডে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগেই তাঁরা গ্রেপ্তার হন। পরে রোজভ্যালিকাণ্ডে সাংসদ তাপস পাল গ্রেপ্তারের ঘটনাতেও নেত্রীকে বিচলিত দেখা যায়নি। যদিও তাপসবাবু গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই পাঁচশো ও হাজারের নোট বাতিল হয়েছিল। কিন্তু সুদীপের গ্রেপ্তারের পরেই নেত্রী মোদীজীর প্রতিহিংসার রাজনীতির তত্ত্বটি খাড়া করে রাজ্যজুড়ে হাঙ্গামা শুরু করে দিয়েছেন। কেন? সুদীপবাবু এমন কোনো তথ্য জানেন যা ফাঁস হলে নেত্রীর বিপদ হতে পারে। তাঁর সততার ইমেজ নষ্ট হতে পারে। তাই কুণাল, মদন, তাপস পালরা গ্রেপ্তার হলে নেত্রী রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলেননি।

দেশের ঝানু গোয়েন্দাদের নিয়ে গড়া সি বি আই-এর লাগাতার জেরার মুখে সুদীপবাবু কতদিন তথ্য গোপন রাখতে পারেন সেটাই এখন দেখার। তিনি যে তা পারবেন না সে কথা নেত্রী বুঝে গেছেন। বুঝেছেন বলেই রাজ্য বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারকে রাজ্য পুলিশ প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তারির বদলা গ্রেপ্তারি। চোখের বদলে চোখ। পশুখাদ্য চুরির মামলায় বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ জেলযাত্রা করেছেন। দুর্নীতির মাধ্যমে অগাধ সম্পত্তি করার মামলায় তামিলনাড়ুর প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতাও জেলবন্দি হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই প্রতিহিংসার রাজনীতি করেননি। আইনের পথেই লড়াই করেছেন। চোখ উপড়ে নেওয়ার রাজনীতি করেননি। আইনের লড়াই আদালতে হয়। প্রকাশ্য রাজপথে

গূঢ়পুরুষের কলম

বোমা-বন্দুক নিয়ে হাঙ্গামা করে হয় না। জয়প্রকাশবাবুকে গ্রেপ্তার করে নেত্রী বুঝিয়ে দিলেন প্রতিহিংসার রাজনীতিটাই তাঁর প্রথম পছন্দ। জয়প্রকাশবাবুকে গ্রেপ্তার করে এই বার্তাই দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী।

তবে নেত্রীর আসল লক্ষ্য বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি খড়্গপুরের বিজেপি বিধায়ক। সম্প্রতি খড়্গপুরের ডন শ্রীনু নাইডুর খুনের পর দিলীপবাবুর দিকে আঙুল তুলেছেন সেখানের তৃণমূল নেতারা। বোঝাই যাচ্ছে কার নির্দেশে এই আঙুল তোলা হচ্ছে। এই খুনের ঘটনায় এখন পর্যন্ত যাদের ধরা হয়েছে তাদের একজনের সঙ্গেও রাজনীতির সম্পর্ক নেই। সকলেই দাগি দুষ্কৃতী। এলাকা দখলের লড়াইতে খুন হয়েছে মাফিয়া ডন শ্রীনু নাইডু। নিহত ডনের স্ত্রী পূজা নাইডু বলেছেন ধৃত দুষ্কৃতীরা তাঁর স্বামীরই সহচর। তিনি এদের হাতে রাখি বেঁধেছেন। পরে কলকাতা থেকে নির্দেশ আসে বিজেপি বিধায়ক দিলীপবাবুকে এই খুনের মামলায় জড়াতে হবে। শ্রীনু-র স্ত্রী পূজা স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলার। দলের নির্দেশে তিনি পরে সন্দেহভাজনদের তালিকায় বিজেপি বিধায়কের নাম ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

অথচ শ্রীনু নাইডুর খুনের পরেই স্থানীয় বিধায়ক হিসাবে দিলীপবাবু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহকে চিঠি দিয়ে ঘটনার সি বি আই তদন্ত চেয়েছেন। কারণ, তৃণমূল নেত্রী প্রতিহিংসার রাজনীতি করতে গিয়ে তাঁকে খুনের মামলায় ফাঁসাতে চাইছেন। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তৃণমূলের মহুয়া মৈত্র। তাঁর অভিযোগ, টিভি চ্যানেলের একটি বিতর্ক সভায় কথা চালচালির সময় বাবুল সুপ্রিয় জানতে চেয়েছিলেন তিনি 'মহুয়া' খেয়েছেন কিনা। এতে তাঁর মানহানি হয়েছে। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই তড়িঘড়ি কলকাতা পুলিশ কর্তারা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে তলব করেছেন। অর্থাৎ, বাবুল সুপ্রিয়কে জিজ্ঞাসাবাদের নামে গ্রেপ্তার করা হবে। কিন্তু এইভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে যে গ্রেপ্তার করা যায় না সেকথা নেত্রীকে বোঝাবে কে? নেত্রী যে প্রতিহিংসার নয়া রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গে চালু করেছেন তার প্রমাণ আসানসোলে বাবুলের সাংসদ মেলা এবং ব্রিগেডে আর এস এসের সভা নিয়ে সংঘাত গড়ায় হাইকোর্টে। দুটি ক্ষেত্রেই নেত্রীর দলবলের পরাজয় ঘটেছে। বিচার ব্যবস্থা সংবিধান মেনে চলে। আদালতের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা আছে। আদালত কোনও রাজনৈতিক দলের বশংবদ অফিস নয়। নেত্রী সে কথাটা ভুল যান। তাই হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার ৯৫ শতাংশ মামলায় হারে। নোট বাতিলকে কেন্দ্র করে দেশের কোনও রাজ্য সরকার আন্দোলনে নামেনি। সব রাজ্যই চেয়েছে দেশে কালোটাকার রমরমা বন্ধ হোক। পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র ব্যতিক্রম, কেন? দেশের একজন মুখ্যমন্ত্রীও বলছেন না যে সরকারি কর্মীদের বেতন দেওয়া যাবে না। শুধু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন বেতন কিস্তিতে দেওয়া হবে। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন না পাঁচশো ও হাজারের নোট বাতিলে দিদির কিঁউ গুস্সা আতি হ্যায়। কেয়া ডাল মেঁ কুছ কালা হ্যায়? ▮

বনবাসে গেলেন রামচন্দ্র, রেখে গেলেন আম্মাকে

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

এই চিঠিতে এক যন্ত্রণার কথা লিখলাম। কেউ হাসবেন না প্লিজ। অবশেষে ভগবান রামচন্দ্রকে কোনো অপরাধ ছাড়াই বনবাসে পাঠালেন আমাদের রাজ্যের দিদি সরি ফুফা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রেখে গেলেন আম্মাকে।

এখন স্কুলের বইতে বলা হচ্ছে, জনক মানে বাবা নয়, 'আব্বা'। তাঁর ভাই 'চাচা' এবং বোন 'ফুফুআম্মা'। এঁদের সকলকে যাঁরা জন্ম দিয়েছেন তাঁরা আবার ঠাকুমা বা ঠাকুরদা নন। তাঁরা হচ্ছেন 'দাদা' এবং 'দাদি'। শুধু তাই নয়, মা-এর অপর নাম 'আম্মা'। মায়ের বোন 'খালাআম্মা'। মায়ের জনক-জননী হচ্ছেন 'নানা-নানি।' এখন পশ্চিমবঙ্গের শিশুদের এটাই শেখানো হচ্ছে। সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার। নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি বইতে এমনই রয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর পরিবেশ বিদ্যার বইতে শিশুদের নিকট আত্মীয়দের সম্পর্ক বোঝাতে এই বর্ণনা করা হয়েছে। সানিয়া নামের এক মুসলমান মেয়ের পরিবারের শাখা- প্রশাখার বর্ণনা করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু মুসলমান পরিবারের উদাহরণ কেন দেখানো হয়েছে এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। কিন্তু তার উত্তর নেই।

পরিবারের সম্পর্ক দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি রাজ্য সরকারের সিলেবাস কমিটি। সপ্তম শ্রেণীর পরিবেশ ও বিজ্ঞান বইয়ের 'বর্ণালি' অধ্যায়েও রয়েছে চমক। ওই অধ্যায়ের হাতে-কলমে অংশে রামধনুকে লেখা হয়েছে 'রংধনু'। রামধনুর সাত রঙের বর্ণনা করার সময় পঞ্চম রঙের নাম হয়েছে 'আসমানি'। যা সাধারণত 'আকাশি' বলেই এতদিন পরিচিত ছিল।

দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গীতা পড়ানো বাধ্যতামূলক করার কথা উঠলে অনেকেই তার সমালোচনা করেছিলেন। সমালোচকদের অভিযোগ ছিল যে, গীতা পড়ানোর মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থায় গৈরিকীকরণ করা হবে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থায় এহেন ইসলামিকরণ নিয়ে সেই প্রতিবাদীরা কী বলবেন?

Rainbow বাংলায় যা রামধনু। সূর্যের এই সাতরঙা বিভাকে এতদিন এই নামেই জানত বিশ্বের আনাচে-কানোচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আপামর বাঙালি। তবে আর নয়। এবার থেকে 'রামধনু' পরিচিতি পাবে 'রংধনু' নামে। আসলে পুরাণেও একটি মত আছে রামধনু নিয়ে। বলা হয়, এই রামধনু আসলে ভগবান রামের ধনুক। আর রাম মানেই নাকি হিন্দু! সনাতন ভারতের এমন চরিত্র হিন্দু তো অবশ্যই। আর পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে কোনো সাম্প্রদায়িকতার ছাপ থাকতে পারে না। সেই কারণেই রাতারাতি রামধনু পাল্টে রংধনু করে দেওয়া হলো। ভৌতবিজ্ঞানের বর্ণালি অধ্যায়েও রামধনুর জায়গায় রংধনু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

তাই বাধ্য হয়ে দিদির কাছে কয়েকটা প্রশ্ন। আপনারা যাঁরা এটা মেনে নিয়েও চুপ থাকবেন তাঁদের কাছেও কয়েকটা প্রশ্ন নিবেদন করতে চাই—

১. মা-মাটি-মানুষের নতুন নাম কী হবে?
২. রামছাগল, রামগরুড়রা কী তবে রং বদলাবে?
৩. রামায়ণ পড়ার সময়ে কী শ্রীরংচন্দ্র পড়তে হবে?
৪. সীতারং ইয়েচুরি কি নামবদলে খুশি হবেন?
৫. রংকৃষ্ণ মিশন নামটা কী ভাল শোনাবে?
৬. রংকৃষ্ণ পরমহংসদেব কি খুশি হবেন?
৭. ক্ষুদিরং বসু কেমন লাগবে শুনতে?
৮. দিদিমণির দুই ভাই কার্তিক, গণেশের কী হবে?
৯. রংনবমী তিথিতে দিদি কী ভাষায় শুভেচ্ছা জানাবেন?
১০. দিদির সাধের মা উড়ালপুল কি আম্মা উড়ালপুল হবে?

— **সুন্দর মৌলিক**

হবু 'পশ্চিম বাংলাদেশ' থেকে একটি প্রতিবেদন

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

অনুশব্দটির শিরোনাম ছিল 'The Saga of Balochistan & Kashmir'। কিন্তু বিশেষত বালুচিস্তানের স্বাধীনতা চাওয়াটা কলকাতায় সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির ক্ষেত্রে বিপজ্জনক। সেজন্য 'ক্যালকাটা ক্লাবে' গত ৭ জানুয়ারি, ২০১৭ কলকাতা পুলিশ তারেক ফতেহ্'র একটি অনুষ্ঠান বাতিল করেছে। অথচ একই দিনে 'কলকাতা প্রেস ক্লাবে' একটি অনুষ্ঠানে যে জঘন্য কুরুচিকর ঘটনা ঘটানো হয়েছে, কলকাতা পুলিশ কিছু করবে কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। কারণ বাংলায় এখন বকলমে মুসলমান শাসন চলছে। অবস্থা এমন যে বোঝা যায় না, আমরা কি ১৯৪৭-পূর্ব মুসলিম লীগ শাসিত বাংলাতেই ফিরে গেলাম নাকি?

হিন্দু সমাজের একটি বড় অংশ সাত-আট দশক ধরে পৃথিবীর সর্বত্র বাতিল কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের দ্বারা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে প্রভাবিত। তাদের সিংহভাগ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু হিসেবে অত্যাচার সহ্য করেছেন, উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে। এসেই তারা হিন্দু-পরিচয় মুছতে লেগেছেন। এরা অদ্ভুত মানসিকতার শিকার। উদ্বাস্তু কলোনির ঠিকানা বদলে অন্যরকম নাম নিয়ে বাস করতে এদের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। পাশাপাশি এরা নাস্তিকতার পূজারি—দেবতার প্রতি নম্রতা, ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন এদের কাছে আধুনিকতার পরিপন্থী। অথচ মুসলমানরা কান ফাটিয়ে আজান শোনালে এদের কিছু বলার নেই। তখন এরা বিচিত্র রকম মৌন অথবা হয়তো এতেই ধর্মনিরপেক্ষতা বলে মনে করেন। যতদিন না হিন্দু সমাজের তরুণ-তরুণীরা ইতিহাস-নিষ্ঠ, পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক বিবেচক না হচ্ছে—বাংলায় এই বিকৃত ভ্রান্ত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মৃত্যু ঘটবে না। ততদিন হিন্দু সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আত্মসচেতন হবে না।

তারিক ফতেহ্

'আরেক রকম' পত্রিকার ১--১৫ জানুয়ারি ২০১৭-র সম্পাদক শ্রীকুমার রানা একটি সমস্যার দিকে দৃষ্টি ফেলেছেন। ওই পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে কুমার লিখেছেন কালিয়াচক-হালিশহর- ধুলাগড়ের দাঙ্গার কথা। আমরা এগুলিকে দাঙ্গা বলে চিহ্নিত করতে চাই না। দাঙ্গা হয়, একই সঙ্গে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মাঝামারি-লুঠ-হাঙ্গামা-হত্যাকাণ্ড ঘটলে। কালিয়াচকে থানা আক্রমণ, হিন্দুদের সম্পত্তি লুণ্ঠন, নারী লাঞ্ছনার ঘটনা একতরফা; হালিশহরের হাজিনগরে ঘটনাও তাই। ধুলাগড়ের বিভিন্ন গ্রামে ব্যানার্জিপোল বা সাঁকরাইল থানার তেহট্ট গ্রামের ঘটনাগুলি একতরফা—হিন্দু মন্দির ভাঙা, স্কুলে পাকিস্তানের পতাকা নিয়ে নবী দিবস পালন আর সরস্বতীপুজো না করতে দেবার ফতোয়া দেওয়া। বাড়ির পর বাড়ি পুরিয়ে দেওয়া একান্তভাবেই হিন্দু বিরোধী আক্রমণ। চোপড়ার রথযাত্রা বন্ধ করা, রথের চূড়া ভেঙে ফেলা; মল্লারপুরে মহরমের চাঁদা দিতে না চাওয়ায় তরুণ হিন্দু অভিজিৎ দত্তকে পিটিয়ে হত্যা, পরে হিন্দুদের দোকান বাড়িতে চড়াও হয়ে লুঠপাট চালানো— থানায় আক্রমণ; কাটোয়ার পাশের গ্রামের শিবমন্দিরে গোরুর হাড় ফেলে দেওয়া, তারপর হিন্দুদের প্রতিবাদের সময় মুসলমানদের চড়াও হওয়া; একের পর এক ঘটে যাচ্ছে এই সমস্ত ঘটনা, পুলিশ নীরব।

উক্ত সম্পাদকীয়টিতে লেখা হয়েছে একসময় বাম শাসনের সময় মুসলমানরা ভালো ছিলেন না। তাদের অনগ্রসরতা, পশ্চাদপদতা ছিল সীমাহীন। বামপন্থী নেতা-নেত্রীদের মনে নাকি তখন 'প্রচ্ছন্ন ইসলাম বিদ্বেষ' ছিল। তবে তারা সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি রক্ষা করার চেষ্টা করে গেছেন। এখনকার সরকার মুসলমানদের অশিক্ষা-বেকারত্ব-অনগ্রসরতার ব্যাপারটিকে খুঁচিয়ে তুলছে। ফলে দিকে দিকে মুসলমানদের মধ্যে জঙ্গি আক্রমণাত্মক ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক হিন্দু-বিরোধী আক্রমণগুলির পিছনে এই রাজনৈতিক মতলবি অবস্থানই দায়ী। আপাত দৃষ্টিতে এই বিশ্লেষণ ঠিক। তবে এতে সমস্যাটিকে ঠিকমতো ধরা হয়নি বলে মনে করি। বিপদটিকে ছোট করে দেখানো হচ্ছে। কুমার রানার মনে পড়েনি। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট। খলিফা বাগদাদির জেহাদি জঙ্গি ফিদায়ি ইসলামি ভাবধারা বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় হতে থাকা, ইরাক-সিরিয়ার ঘটনাবলী, জাকির নায়েকের পিস-টিভির জনপ্রিয়তা, বাংলাদেশের জঙ্গিদের দ্বারা পরিচালিত খারিস্তা মসজিদ গড়ে ওঠা, সেখানে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র ঘটানো, বর্ধমান খাগড়াগড়ের ভয়াবহ বিস্ফোরণ—তাঁর মনে পড়েনি। শুধু দেখেছেন—'নতুন শাসকবর্গ মুসলমানদের বঞ্চনাবোধক কাজে লাগিয়ে..... বিভেদমূলক পথ' নিয়েছে তৃণমূল শাসকবর্গ। ফলে এই ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

বাংলার সংবাদপত্র গণমাধ্যমগুলো যখন উক্ত ঘটনাগুলির দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না— এসব বলা হয়তো তাদের কাছে ভাসুরের কাছে ঘোমটা খোলার চেয়েও ভয়ঙ্কর ঘটনা। তখন বামপন্থীদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা শুদ্ধতর বামপন্থী পত্রিকার যাহোক এরকম একটি লেখা তো এল। একই পত্রিকায় এক পত্রলেখক লিখেছেন একটি সুন্দর অনুভবী চিঠি। পত্রলেখক কার্তিক পুজোর চাঁদা চাইতে আশা কিছু লোকের সঙ্গে এক দোকানির কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, ওই দোকানি রাজ্যের আর পুজো-পার্বণ করা যাবে কিনা সন্দেহ প্রকাশ

করেছেন। রাজ্যে গত কয়েক বছর ধরে এরকম ঘটনা স্রোত এক সাধারণ দোকানীর নজরও এড়াইনি। ঐ পত্রলেখক লিখেছেন, বাঙালি হিন্দুরা সন্তান সন্ততির সংখ্যা এক বা বড়জোর দুইতে সীমাবদ্ধ রাখছেন; তাদের ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানাতে পারলে বর্তে যাচ্ছেন। অথচ এরা অন্যত্র চলে যাচ্ছে চাকরির সুবাদে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আগলে রাখছেন বড় বড় বাড়ি ঘর। কিন্তু কতদিন?

অন্যপক্ষে, মুসলমানরা বহুবিবাহ, জন্মনিয়ন্ত্রণ তোয়াক্কা না করে যথেচ্ছ সন্তান বাড়িয়ে চলেছে। ফল মারাত্মক। তাদের মানসিকতার স্পষ্ট প্রমাণ মিলছে সর্বত্র। মূলতঃ খেটে খাওয়া কাজকর্মে তাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষিত, তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত মুসলমানরাও কম যাচ্ছেন না। শাহরুখ খান তৃতীয় সন্তান দত্তক নিয়েছেন—আমির খান পুত্র কন্যা থাকা সত্ত্বেও কিরণ রাও-কে বিয়ে করেছেন, আবার সন্তান দত্তক নিয়েছেন! সইফ আলি খান অমৃতা সিং-কে বিয়ে করে দুটি মুসলমান সন্তানের জন্ম দিয়ে সন্তুষ্ট থাকেননি, কারিনা কাপুরকে বিয়ে করে আর এক পুত্র সন্তান 'তৈমুর'-এর জন্ম দিয়েছেন। এইসব শব্দের শেষ লক্ষ্য দেশকে সংখ্যা গরিষ্ঠতায় দখল করা। ওই পত্র লেখকের বক্তব্যের মাধ্যমে একদিন আমাদের বাড়ি ঘর ওইসব অপরাধপ্রবণ মুসলমানদের হাতে চলে যাবার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, এই আশঙ্কা বাংলার সর্বত্র হিন্দু সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

এ অবস্থায় বাংলার রাজধানী কলকাতায় 'প্রেস ক্লাবে' প্রকাশ্যে উপরের 'ফতোয়া'-টির কথা লিখতে হচ্ছে। 'ফতোয়া' দেওয়া হয়েছে টিপু সুলতান মসজিদের শাহি ইমাম মৌলনা নূরুর রহমান বরকতির নামে। এমন একটি ঘোষণা ইসলাম ধর্মনেতা ছাড়া আর কারো পক্ষেই করা সম্ভব নয়। কী আছে সেখানে? একটু দেখুন :

'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দাড়ি কেটে এবং মাথা মুড়িয়ে (চুল কেটে) দিয়ে কালি মাখিয়ে দিতে পারলে তাকে পঁচিশ লক্ষ (২৫ লক্ষ) টাকা এনাম (পুরস্কার) দেওয়া হবে।'

এর একাংশে আছে 'সম্প্রীতি এবং শান্তি বজায় রাখার আহ্বান'! কিন্তু এই ঘৃণ্য ভাষায় কোথাও কি সম্প্রীতি বা শান্তিবজায় রাখার ইঙ্গিত আছে? আমাদের মনে হয় নরেন্দ্র মোদীর সমর্থক হোক না হোক যে কোনো গণতন্ত্রপ্রেমী ব্যক্তির এইরকম ঘোষণা দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করা উচিত।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর ভাই মোদী কারো দয়ায় সরকারের প্রধান হননি। তাঁকে একজন ঘৃণ্য অপমান-জনক ফরমান দিচ্ছেন এক বিচিত্র ধর্ম ব্যবসায়ী আর তাকে এই নাটক করতে দিচ্ছে 'কলকাতা প্রেস ক্লাব', প্রশ্রয় দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ। আমরা কি মুসলিম লীগ শাসিত বাংলাতে ফিরে যাইনি। বরকতির দাবি, 'নোটবন্দি কাণ্ডে' সাধারণ মানুষের অসুবিধা ক্রমেই বাড়ছে। ভারতবর্ষের বেশিরভাগ মানুষ নাকি মমতা ব্যানার্জীকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চাইছেন!

এই উন্মত্ততার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হল এইবার। দিল্লীর 'যন্তর-মন্তর', 'প্যাটেল চক', 'রাষ্ট্রপতি ভবন', সবজি মান্ডিতে কক্ষে না পেয়ে—লক্ষ্ণৌতে জনহীন ময়দানে হাত পা নেড়ে ততোধিক হতাশ হয়ে, তারও পরে পাটনায় জনতাহীন জনসভায় নিজের অক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে স্বয়ং মমতা বন্দোপাধ্যায়ই যে এ ফতোয়ার আড়ালে আছেন বা বুঝতে কারো অসুবিধা হবার কথা নয়।

কিন্তু ওই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন লোকসভার সদস্য ইদ্রিশ আলি; তাঁর পোশাক ছিল বিচিত্র। 'মমতা ব্যানার্জীর ছবি লাগানো পাঞ্জাবি এবং টুপি পরে বসেছিলেন, পাশে ছিল 'কালি লাগানো ছবি নরেন্দ্র মোদীর', উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার এক সদস্য আহমদ হাসান ইমরান। এই সদস্য সম্পর্কে ইদানীং প্রশ্ন উঠেছে তিনি পাকিস্তানের নাগরিক! ১৯৭০ সাল বংংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে রাজাকার বাহিনীর হয়ে কাজ করেছেন; অনুপ্রবেশ করেছেন বেআইনিভাবে, প্রথমে ধুবড়ি-গোয়ালপাড়া, তারপর পার্কসার্কাসে চলে আসেন ইনি---গড়ে তোলেন সিমি (স্টুডেন্ট ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া)-এর কেন্দ্রীয় দপ্তর ছিল দিল্লির দরিয়াগঞ্জ অঞ্চলে। পরে ওই সংগঠন অবৈধ ঘোষিত হয়। রাজ্যসভার সদস্য হবার সময় এই গুণধর একই ঠিকানা ব্যবহার করেছেন! যাই হোক, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই অবমাননার দায় ইদ্রিশ আলি-আহমেদ হাসান ইমরানের বিরুদ্ধে অবশ্যই যায়। আমার ধারণা আমাদের রাজ্যের দুই লোকসভার মাননীয় সদস্য বা দুই রাজ্য সভার মাননীয় সদস্য যাঁরা বি.জে.পি-র সমর্থনে জিতেছেন বা মনোনীত হয়েছেন, তাঁরা এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নিশ্চয় নেবেন।

উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন নাখোদা মসজিদের ইমাম মৌলানা ব্বাবী মহম্মদ সফিক কাশনি, শিয়া-দের সংগঠন অল ফেইথ ফেরাম-এর সহসভাপতি ইমাম হাবিবুর রহমান আর বেঙ্গল ইমাম অ্যাসোসিয়েশন-এর চেয়ারম্যান হাফেজ মহম্মদ ইয়াহিয়া। সব থেকে বিচিত্র তথ্য একটি হলো আইনজীবী দেবব্রত চ্যাটার্জী আর কালীঘাটের পুরোহিত শ্রী কেশব চ্যাটার্জীরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কালীঘাট মন্দিরের পুরোহিত এখন আদ্যাশক্তি মহামায়াকে ত্যাগ করে কোন সুরাযুক্ত সাধনায় যুক্ত হয়েছেন জানি না। অনুষ্ঠানটির আহ্বায়ক ছিলেন এম. এ. আলি। আয়োজক ছিল দুটি সংগঠন। অল ইন্ডিয়া মজলিশ-এ-সুরাহ (টিপু সুলতান মসজিদ) আর অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ফোরাম (পশ্চিমবঙ্গ, ৭ রিপন লেন, কলকাতা---৭০০০১৬)। শেষোক্ত সংগঠনটির চলভাষ নম্বরও প্রদত্ত হয়েছে ৯৮৩০২২৭৪৬০।

সারা ভারত সংখ্যালঘু মঞ্চে তো বৌদ্ধ-জৈন-শিখ প্রতিনিধিরাও আছেন। তারা কি এই সভার সংবাদ জানতেন? তাদের সবাই কি এই ধর্মধ্বজীর হুকুম-ফরমান সমর্থন করেন? যদি না করেন তাহলে তারা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করবেন কি? বাঙালি হিন্দুদের কেউ কালীঘাটের মাতৃমন্দিরের ওই কুলাঙ্গার কেশব চ্যাটার্জির বিষয়ে খোঁজ খবর নিলেও পারেন। মোট কথা, পশ্চিমবঙ্গ এখন অনেকটাই পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়ে পড়ছে। এখন আমাদের ঘর সামলানোর প্রয়োজন সর্বাগ্রে। বিশেষত বাঙালি তরুণ-তরুণীদের কাছে এটুকু আবেদন করলাম। ■

‘হিন্দ কী হিম্মত’ গুরুগোবিন্দ সিংহ

তরুণ বিজয়

গুরু গোবিন্দ সিংহের ৩৫০তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁরই জন্মস্থান পাটনায় জাতীয় একতার এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল। সেখানে একই মঞ্চে বসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের প্রশংসা করেন এবং নীতিশ কুমারও প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করেন— গুজরাটে মাদক নিষিদ্ধ করার জন্য। দু'জনেই রাজনৈতিক মতাদর্শে আলাদা, পরস্পর রাজনৈতিক বিরোধিতাও করেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অভিন্ন ভাবনা গণতন্ত্রের পক্ষে একান্ত মঙ্গলজনক— তা গুরুগোবিন্দ সিংহের মহাপরাক্রমী জীবন-স্মরণ অনুষ্ঠানে আর একবার প্রমাণিত হলো।

বস্তুত রাষ্ট্রের বিজয়গাথা হলো গুরুগোবিন্দ সিংহের জীবন। বিশ্বের ইতিহাসে এমন দ্বিতীয় কোনো উদাহরণ নেই যেখানে দেশ ও ধর্মের জন্য পিতা তাঁর বালকপুত্রদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছেন। তিনি পবিত্রতার প্রতীকস্বরূপ খালসাপন্থের সৃষ্টি করেন এবং দেশকে এক অপূর্ব বিজয়গাথা প্রদান করেন —

‘দেহ শিবা বর মোহে ইহৈ
শুভ করমন তে কহহুঁ ন টরৌঁ
ন ডরৌ অরি সৌ জব জাহি লরৌঁ
নিশচৈ কর অপনী জীত করৌঁ।’

(দশম গ্রন্থ)

অর্থাৎ ‘হে শিবশম্ভো! এই আশীর্বাদ কর প্রভু / মহৎযোগে যেন পিছিয়ে না পড়ি কভু / যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসমরে না আসে যেন মনে ভয়/ জয়লাভে যেন আমি থাকি দৃঢ়নিশ্চয়।’

গুরুগোবিন্দ সিংহের পিতা সাচ্চা প্রভু গুরু তেগবাহাদুর এমন একজন মহাপুরুষ ছিলেন যাঁকে ‘হিন্দ কী চাদর’ বলা হোত। তিনি শুধু পঞ্জাবের চাদর (রক্ষক) ছিলেন না; পন্থ, ভাষা, ক্ষেত্র অথবা কেবল নিজ শিষ্যের রক্ষক ছিলেন না, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের রক্ষক ছিলেন। এরকম মহিমাময় পিতার সন্তান ছিলেন গোবিন্দ রায় (বাল্যকালের নাম)। অন্যায়-অত্যাচারের শিকার কাশ্মীরের হিন্দুরা যখন গুরু তেগবাহাদুরের শরণাপন্ন হয়ে প্রাণ রক্ষার আবেদন জানায় তখন তিনি বলেন— ‘হিন্দুদের রক্ষার জন্য এসময় কোনো মহাপুরুষের জীবন বলিদান দিতে হবে।’ একথা শুনে বালকপুত্র গোবিন্দ রায় বলে ওঠে— ‘পিতা! দেশে আপনার চেয়ে বড় আর কে মহাপুরুষ আছেন?’ দেশ, ধর্ম ও হিন্দুদের রক্ষার জন্য পিতাকে উদ্বুদ্ধ করায় তিনি বালকপুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের অভয়দান করেন। তারপরের কথা প্রেরণাদানকারী ইতিহাস। তিনি এবং তাঁর দুই শিষ্য ভাই মতিদাস ও ভাই সতীদাস আগ্রার দরবারে নিজেদের প্রাণ দিয়ে সমাজকে রক্ষা করেন। আমার অনেকবার মনে হয়েছে— ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে এবং মন্দিরে মন্দিরে যদি কোনো চিত্র লাগাতেই হয় তবে তা গুরু তেগবাহাদুর ও গুরুগোবিন্দ সিংহের হওয়া চাই।

অপূর্ব বলিদানী পরম্পরা! গুরুগোবিন্দ সিংহের তেরো ও চোদ্দ বছরের পুত্র জোরাবর সিংহ ও ফতেহ্ সিংহকে ঠাকুমা গুজরিবাঈ তাদের শত্রুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বনে-জঙ্গলে ঘুরছিলেন। সেখান থেকে তাদের বন্দি করে সরহিন্দের দুর্গে নিয়ে গিয়ে ধর্মপরিবর্তনের জন্য ভয় দেখানো হচ্ছিল। কোনোরূপ ভয় ও চাপের কাছে নতি স্বীকার না করায় কাজির নির্দেশে দুই ভাইকে জীবন্ত অবস্থায় দেওয়ালে গেঁথে দেওয়া হয়। তেরো ও চোদ্দ বছর বয়সের বালকের

জীবন উৎসর্গ— এ কী কল্পনা করা যায়! সিংহের শিশুরাই এরকম করতে পারে। একটি একটি ইট গাঁথা হচ্ছে কিন্তু জোরাবর সিংহ ও ফতেহ্ সিংহ তাদের পিতার শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়নি— জীবন দিয়েছে কিন্তু ধর্ম দেয়নি।

এরকম পরাক্রম, বলিদানী পরম্পরা এবং রাষ্ট্রীয় একতার গৌরবের প্রতীক গুরুগোবিন্দ সিংহের একটিই কথা মৃতের শরীরে প্রাণসঞ্চার করতে পারে— জাতিকে নববলে বলীয়ান করতে পারে, তাহলো 'সারা পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে গেলেও আমরা জিতবই, বিজয় আমাদের হবেই।'

গুরুগোবিন্দ সিংহের এই একটি বাণী আমাদের রাষ্ট্রের মন্ত্র হয়ে রয়েছে। 'সোওয়া লাখ সে এক লড়াউঁ'-এর মধ্যেই শক্তির পুঞ্জ, সাহসের হিমালয় এবং জাগরণের জয়গান নিহিত রয়েছে। তাঁর দশমগ্রন্থের বাণী— 'নিশচৈ কর অপনী জিত করৌ' আমাদের রাষ্ট্রীয় যুবসঙ্গীত হয়েছে, যা শুনলে ধমনিতে রক্ত নাচতে শুরু করে এবং মনে শুভ ও মঙ্গলদায়ক ভাবনার উদয় হয়। মানুষের শক্তির সীমা ও দুর্বলতার অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। সেজন্য তিনি বলেন— 'গুরু মান্যো গ্রন্থ'। শ্রীগুরু গ্রন্থসাহিবকে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে, দেশের বিভিন্ন ভাগে শ্রেণী ও বর্ণের প্রতিনিধি পাঁচজন শ্রেষ্ঠপুরুষকে পঞ্চপ্যারের রূপে স্থান দিয়ে খালসাপন্থের সৃষ্টি করেন। এ অদ্ভুত, অসাধারণ ও অভূতপূর্ব! ভাই দয়া সিংহ লাহোর থেকে, ভাই ধরম সিংহ উত্তরপ্রদেশের হস্তিনাপুর থেকে, ভাই হিম্মত সিংহ ওড়িশা থেকে, ভাই মোহকম সিংহ গুজরাটের দ্বারকা থেকে এবং ভাই সাহিব সিংহ কর্ণাটকের বিদর থেকে পঞ্চপ্যারে হয়েছেন। কী অদ্ভুত মহান দৃষ্টিভঙ্গি! রাষ্ট্রীয় একতার এইভাব, সারা সমাজকে নিয়ে এগিয়ে চলার যোদ্ধা-সদৃশ প্রতিজ্ঞা— খুবই দুর্লভ।

খালসা পন্থের সৃষ্টি করে গুরুগোবিন্দ সিংহ দেশ, ধর্ম ও সমাজকে অত্যাচারী বিধর্মীদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি তৎকালীন সময়ে ভারতের রক্ষাকারী ভুজা হিসেবে দেশকে আগলে রেখেছিলেন। আমি মনে করি, ভারত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় যুবশক্তির দেশ, ক্ষাত্র ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ যুবশক্তির যদি কেউ যুব আইকন থেকে থাকেন তবে তিনি গুরুগোবিন্দ সিংহই। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, তাঁর জীবনকথা কীভাবে আমাদের রাষ্ট্রগাথা হয়েছে— পটনাসাহিবে জন্ম, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত দেশবাসীকে অভয়দান করেছেন, জাতি-বর্ণকে একসূত্রে গ্রথিত করেছেন, সমাজে প্রেরণাদায়ী রচনা ব্রজভাষায় করেছেন, অত্যাচারী বিধর্মী শাসকের বিরুদ্ধে প্রত্যেক মানুষকে সৈনিক হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন এবং শস্ত্রের সঙ্গে শাস্ত্র, সন্তের সঙ্গে সিপাহির অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে রাষ্ট্র ও ধর্মকে অটুট রাখার পরিকল্পনা করছেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রাষ্ট্র ও ধর্মের যদি কেউ সত্যিকারের সন্তান (জনক নয়) থাকেন তাহলে তিনি সাচ্চা পাতশাহ দশম গুরুগোবিন্দ সিংহ। এই সন্ত-সিপাহি রাষ্ট্র ও ধর্মের জন্য যুদ্ধ করেছেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনাও করেছেন। তাঁর ভাবনায় এ দুটি আলাদা হতে পারে না। অধ্যাত্মের অর্থ শুধু নিজের জন্য গিরি-কন্দরে বসে তপস্যা করা নয়। অধ্যাত্মের অর্থ হলো— জনকল্যাণ, জনরক্ষা, জনসেবা ও জনসংগঠন।

আজ দেশ যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে চলেছে গুরুগোবিন্দ সিংহের বাণী থেকে প্রেরণা নিয়ে তা থেকে বেরিয়ে, মুক্ত হয়ে, উদ্দীপিত হয়ে এগিয়ে যাবে। অশুভ শক্তির দূত গুরুসাহেবের রণহুঙ্কারের সামনে পরাস্ত হবে— 'সোওয়া লাখ সে এক লড়ানে'র সাহস নিয়ে ভারত জয়লাভ করবে— এই বিশ্বাস গুরুগোবিন্দ সিংহের স্মরণ ও মননে দৃঢ় হবে। সত্যিই তাঁর পিতা 'হিন্দ কী চাদর' আর তিনি 'হিন্দ কী হিম্মত'।

(প্রবন্ধকার রাজ্য সভার প্রাক্তন সদস্য এবং খ্যাতনামা স্তম্ভলেখক)

কর্মখালি

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা প্রকাশনা, অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর শ্রেণীকে সহায়তা প্রদান এবং জাতীয় স্বার্থের অনুপন্থী সভাসমিতি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত একটি এনজিও নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করছে।

১. **অফিস ম্যানেজার :** প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা অবশ্যই এমবিএ (রেগুলার কোর্স) হতে হবে। সেইসঙ্গে থাকতে হবে বন্ধুভাবাপন্ন এবং দৃঢ় ব্যক্তিত্ব। বাংলা এবং ইংরেজি দুটি ভাষাতেই সচ্ছন্দ হওয়া ও কম্পিউটারে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সংস্থা প্রার্থীর আত্মমর্যাদাবোধ, নিজেকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা, দলের একজন হয়ে কাজ করার মানসিকতা, সহকর্মীদের প্রতি সহমর্মিতা, শৃঙ্খলাবোধ এবং পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে চলার মনোভাব প্রত্যাশা করে। প্রথম ছয়মাস অস্থায়ী কর্মী (বেতন ছয় হাজার টাকা) হিসেবে কাজ করার পর উপযুক্ত বিবেচিত হলে উচ্চ বেতনে নিয়োগ করা হবে। বয়সসীমা অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।

বিজ্ঞাপন প্রবন্ধক : প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা এমবিএ হওয়া আবশ্যক। সেইসঙ্গে থাকতে হবে অ্যাডভার্টাইজিংয়ে ডিপ্লোমা। প্রার্থী অবশ্যই আত্মবিশ্বাসী, ফলাভিমুখী, জনসংযোগে দক্ষ এবং বাংলা ও ইংরেজিতে সমান সচ্ছন্দ ও কম্পিউটারে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে সমন্বয় গড়ে তোলা এবং তার প্রকাশনা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে প্রার্থীকে দায়বদ্ধ হতে হবে। সংস্থা প্রার্থীর আত্মমর্যাদাবোধ, নিজেকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা, দলের একজন হয়ে কাজ করার মানসিকতা, সহকর্মীদের প্রতি সহমর্মিতা, শৃঙ্খলাবোধ এবং পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে চলার মনোভাব প্রত্যাশা করে। প্রথম ছয়মাস অস্থায়ী কর্মী হিসেবে (বেতন ৬০০০ টাকা) কাজ করার পর উপযুক্ত বিবেচিত হলে উচ্চ বেতনে নিয়োগ করা হবে। বয়সসীমা অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।

দরখাস্ত করুন নীচের ঠিকানায় :—

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬, E-mail : swastika5915@gmail.com

ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্রশক্তির মূর্ত বিগ্রহ
গুরুগোবিন্দ সিংহ

সর্দার গুরুচরণ সিংহ গিল

গুরুগোবিন্দ সিংহের জীবনদর্শন ও ব্যক্তিত্বে তৎকালীন রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় পরিস্থিতির সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। যে সময়ে তাঁর আবির্ভাব হয় তখন ভারতবর্ষ বিশেষ করে পঞ্জাবের অবস্থা ছিল ঘোর অন্ধকারময়। দিল্লির তখ্‌তাসীন ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও দমনপীড়নে হিন্দু সমাজ তখন ত্রস্ত ছিল। অন্যদিকে হিন্দু সমাজও উচ্চ-নীচ, জাত-পাত, আচার-ব্যবহার ও অন্ধবিশ্বাসে জর্জরিত ছিল। তৎকালীন হিন্দু নেতৃত্ব সমাজকে সুদৃঢ় ও জাগ্রত করার বদলে তথাকথিত বিশ্বাসের নামে উদাসীন ও ভাগ্যবাদী হয়ে পড়েছিল। বর্ণহিন্দুদের আত্ম-অহংকারের কারণে তথাকথিত অবহেলিত সমাজের মানুষ সদৈব তিরস্কার ও লাঞ্ছনা ভোগ করতো। এর পরিণামে সমাজ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। সমাজকে এই গ্লানি ও জড়তা থেকে মুক্ত করে সংগঠিতভাবে অন্যায়ের মোকাবিলা করা সেই সময় এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। গুরু নানকদেবের গুরুপরম্পরা, ভক্ত কবির, হরিদাস, নামদেব প্রমুখ সন্ত মহাপুরুষ সেসময় সমাজে জাগরণ সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ উৎপন্ন করছিলেন। গুরুগোবিন্দ সিংহের তখন মনে হয়েছিল যে, দেশ ধর্মের স্বাভিমান রক্ষা করা কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্ব অথবা বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া সঠিক ভাবনা নয়। এর জন্য সমাজে জাগরণ সৃষ্টি করে দেশবাসীর মনে প্রেরণা উৎপন্ন করা জরুরি। তিনি একে ধর্মযুদ্ধ নাম দিয়েছেন। তিনি উদাসীপরম্পরার সন্ন্যাসী থেকে শুরু করে জেলে, ধোপা, নাপিত, দোকানদার এবং কৃষকশ্রেণীর জাঠ-সহ সবাইকে এই যুদ্ধে শামিল করেন।

গুরুগোবিন্দ সিংহ সমাজকে শুধু সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য তৈরি করেননি, বরং মনোবৈজ্ঞানিক রূপে আধ্যাত্মিক ভাবনায় আত্মবলিদানের জন্য কর্মযোজনা তৈরি করেন। তিনি শিখদের মনের দুর্বলতা ও কাপুরুষতা জ্ঞানরূপ ঝাড়ুর দ্বারা ঝেঁটিয়ে বিদায় করে প্রভুর নাম স্মরণ করতে করতে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসার প্রেরণা সৃষ্টি করেন। তিনি সবার নামের সঙ্গে 'সিংহ' পদবি ব্যবহার এবং সংঘর্ষ ও বিজয়সূচক নাম রাখার নির্দেশ দেন। তাঁর পুত্রদের নাম অজিত সিংহ, জুঝার সিংহ, জোরাবর সিংহ এবং ফতেহ্ সিংহ এই ভাবনারই প্রতীক। তলোয়ার কোষমুক্ত করে মাথা চাওয়ার পিছনে তাঁর ভাবনা ছিল, যদি স্বাভিমানের সঙ্গে বাঁচতে হয় এবং দেশ-ধর্মকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হয় তাহলে আমাদের প্রাণ বলিদান দিতে হবে।

এর প্রয়োজন ছিল, কারণ নির্ভীক হবার জন্য মৃত্যুভয় থাকলে চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আত্মা অজর ও অমর—এই ভাবনাও দৃঢ় করিয়েছেন। সমাজকে দিশাদর্শনের জন্য আমাদের প্রাচীন মহাপুরুষদের জীবনী তিনি এই ধর্মযুদ্ধের জন্য পুনর্লিখন করেছেন। তিনি রামাবতার, কৃষ্ণাবতার, চৌবিশ অবতার, চণ্ডীচরিত্র, শাস্ত্রমালা ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে সমাজের লোকদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবার প্রেরণা দিয়েছেন। কৃষ্ণাবতারে তিনি খড়্গ সিংহ নামে এক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন এবং তার সঙ্গে যুদ্ধে বহু মুঘলদের নাম যুক্ত করেছেন। পাঁউটা সাহিবে তিনি ৫২ জন কবির মাধ্যমে প্রাচীন গ্রন্থের টীকা তৎকালীন পরিস্থিতি বিষয়ে সাধারণের ভাষায় লিখিয়েছেন। প্রাণোৎসর্গের উদাহরণ তিনি স্বয়ং সৃষ্টি করেছেন। যখন দেশ-ধর্মের রক্ষার জন্য কোনো মহাপুরুষের প্রাণোৎসর্গের প্রয়োজন ছিল তখন তিনি কম বয়সি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পিতা তেগবাহাদুরকে প্রাণোৎসর্গ করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। এই রকম চমকৌর যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর বালকপুত্র জুঝার সিংহকে নিজ হাতে রণসাজে সজ্জিত করে পাঠিয়েছেন। তাঁর দরবারে প্রাণোৎসর্গের এমন পরিবেশ নির্মাণ হয়েছিল যে, তাঁর সাত ও ন' বছরের শিশুপুত্র সুবা সরহিন্দ্-বজির খাঁর বহু প্রলোভন ও ভয় দেখানো সত্ত্বেও হাসতে হাসতে দেওয়ালের মধ্যে জীবন্ত কবরে মৃত্যুবরণ করেছে।

এই প্রেরণার দৃষ্টান্তে সারা সমাজ প্রাণোৎসর্গের জন্য তৈরি হয়ে গেছিল। এর চরম পরিণতি লাভ করেছে খালসা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। এর মাধ্যমে লাহোরের ক্ষত্রিয় সমাজের ভাই দয়ারাম, দিল্লি- হস্তিনাপুরের জাঠ সমাজের ভাই ধর্মচন্দ, দ্বারকার রজক সমাজের ভাই মোহকমচন্দ, কর্ণাটক-বিদরের ভাই সাহিবচন্দ এবং ওড়িশার জগন্নাথপুরীর ভাই হিম্মত রায় পঞ্চপ্যারে রূপে সজ্জিত, হয়েছেন। এই পঞ্চপ্যারে এবং দেশের কোণে কোণে থেকে আসা ২৫ হাজার জনকে একই পাত্রে তৈরি করা অমৃত (সরবত) এক ঢোঁক করে পান করিয়ে তাদের উচ্চ-নীচের ব্যবধান দূর

করে দিয়েছেন। এই পঞ্চপ্যারেকে তিনি সমাজে সর্বোচ্চ স্থান দেন এবং স্বয়ং তাঁদের আজ্ঞাবাহক রূপে কাজ করেন। এই পঞ্চপ্যারে সারা ভারত অর্থাৎ উত্তরে লাহোর, দক্ষিণে কর্ণাটক, পূর্বে নীলাচলক্ষেত্র, পশ্চিমে দ্বারকাক্ষেত্র এবং মধ্য— দিল্লি-হস্তিনাপুর ক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্ব করতেন। এই পাঁচজন নিজ নিজ এলাকা থেকে আনন্দপুর সাহিবে আসার পথে সমুদায় জনসমাজকে জাগ্রত করেছিলেন। গুরু গোবিন্দ সিংহ বিধর্মীদের অত্যাচারের প্রতিকার করার জন্য বান্দা বৈরাগীকে এই মনোভাবনায় সুদূর দক্ষিণ থেকে পঞ্জাবে পাঠিয়েছিলেন। বান্দা বৈরাগী দেশ-ধর্মের রক্ষার জন্য প্রাণোৎসর্গের সংকল্প করেন। গুরুগোবিন্দ সিংহ তাঁর সঙ্গে পাঁচজন শিখ যোদ্ধাকে পাঠান এবং তাঁদের নির্দেশ দেন যে, সমস্ত সিদ্ধান্ত বান্দা বৈরাগীর নির্দেশানুসারে নিতে হবে। যদি সব কাজ গুরুগোবিন্দ সিংহ নিজে করতেন তাহলে সমাজ ভেবে বসতো যে, গুরুজী অবতার পুরুষ, তাই তাঁর পক্ষে এতসব করা সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর অবর্তমানে তাঁর সংগঠন শেষ হয়ে যেতে পারতো। সেজন্য তিনি বান্দা বৈরাগীকে মাধ্যম করে এই জাগৃতির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সমাজকে প্রেরণা ও বার্তা দিয়েছেন। যার কারণে কয়েক বছরের মধ্যে বিধর্মী শাসনের মূলোৎপাটন হয়ে যায় এবং স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক তথা বিদ্বান ক্যানিংহাম লিখেছেন, ''শিখদের শেষ গুরু পরাধীন জাতির সুপ্তশক্তি জাগ্রত ও বিকশিত করে সামাজিক স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় অস্মিতায় ভরপুর করেন। এসবই ছিল গুরু নানকদেব প্রবর্তিত ভক্তিভাবের ধারা। তিনি উচ্চ-নীচ ও জাতপাতের ভেদাভেদ দূর করে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজের উপেক্ষিত শ্রেণীকে নিজের সহযোগী তৈরি করে তাদের মধ্যে অসীম শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করেন।''

তাঁর সৃষ্ট খালসাপন্থের পরিণাম ছিল তাঁর লোকান্তরের পরও শিখেরা হাসতে হাসতে শূলে চড়েছে, একটু একটু করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটার পরও 'ওয়া গুরুজী কী ফতে' স্মরণ করে শান্ত থেকেছে। শুধু তাই নয়, মায়েদের যখন বন্দি করে জেলে নিয়ে গিয়ে সোয়া মন করে গম ভাঙার জন্য বাধ্য করেছে, তাঁদের কোলের শিশু কেড়ে নিয়ে শূন্যে ছুড়ে দিয়ে বর্শায় গেঁথে ফেলেছে অথবা টুকরো টুকরো করে কেটে তা দিয়ে মালা তৈরি করে তাদের মায়েদের গলায় পরিয়ে দিয়েছে তখনও তাঁরা গুরুজীর নাম স্মরণ করে শান্ত থেকেছেন। এই মনোভূমিকার কারণে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পঞ্জাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য ফাঁসীকাঠে ওঠা ও দ্বীপান্তরের শাস্তি ভোগ করা দেশভক্তের তিন-চতুর্থাংশের বেশি এই পঞ্জাবিরা ছিলেন।

গুরুগোবিন্দ সিংহ সমাজকে কেবল যোদ্ধা ও আত্মবলিদানীই নির্মাণ করেননি, তাদের মধ্যে মানবতার সেবার জন্য উচ্চ জীবনমূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভাই কানহাইয়ার সম্পর্কে তিনি বলতেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের জখম সৈনিকদের সে জলপান করাতো। ভাই কানহাইয়া বলতেন, 'মহারাজ আপনি তো আমাকে স্বার্থপর হতে শেখাননি। আমি তো সবার মধ্যে আপনারই রূপ দেখতে পাই।' তখন গোবিন্দ সিংহ তাকে জলপানের পরে ক্ষতস্থানে মলম লাগিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তখন থেকে শিখ সমাজে 'সেবাপন্থী' পরম্পরা শুরু হয়, যার জন্য আজ সারা দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লঙ্গর ইত্যাদি বহু সেবাকাজ চলছে।

সমাজে অধ্যাত্মভাব দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে গুরুগোবিন্দ সিংহ পাঁচজন শিখকে কাশী প্রেরণ করেন বেদান্ত শিক্ষার জন্য। ফিরে আসার পর দরবারে তাদের মুখে ব্রহ্মকথা শুনে তিনি বলেন, 'তোমরা নির্মল হয়ে গেছ।' তখন থেকে 'নির্মল-সন্ত' পরম্পরার সৃষ্টি হয়েছে। গৈরিকবস্ত্র ধারণ করে 'নির্মল-সন্ত' পরম্পরার সাধুরা গ্রামে গ্রামে ধর্মপ্রচার করতে শুরু করেন। বিষম পরিস্থিতির মধ্যে যখন শিখদের বনেজঙ্গলে থাকতে হোত তখন গুরুবাণী ও গুরুশিখদের রক্ষায় এই নির্মল-সন্তরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রাচীন কথাকার কবিচূড়ামণি ভাই সন্তোষ সিংহ, প্রাচীন ইতিহাস লেখক জ্ঞানী জ্ঞানসিংহ থেকে শুরু করে মাস্টার তারা সিংহ, যোগী হরভজন সিংহ, পিঙ্গওয়াড়ার ভগৎ পূরণ সিংহ এই পরম্পরারই দান।

গ্রাম ও নগরব্যবস্থা ঠিক রাখার জন্য এবং সদৈব যুবকদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া ও সমাজ রক্ষায় মানসিকতাকে অটুট রাখার জন্য গুরুগোবিন্দ সিংহ 'নিহংগ্ সিংহ' পরম্পরা চালু করেন। এই পরম্পরার উজ্জ্বল উদাহরণ বান্দ সিংহ বৈরাগী। সমাজের প্রয়োজনে পরে একে দু'ভাগে ভাগ করা হয়— তরুণদল ও বৃদ্ধদল। আহম্মদ শাহ আবদালির আক্রমণ, লাহোরের সুবেদার ইয়াহিয়া খাঁ, মির মনু ও বিভিন্ন মিসলের সঙ্গে যুদ্ধে এই নিহঙ্গ সিংহের সর্দাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

গুরুগোবিন্দ সিংহ সমাজের মানসিক শক্তি ও বৌদ্ধিক জাগরণের জন্য প্রাচীন বীরপুরুষ ও বীরত্বমূলক গল্পগাথাগুলিকে উৎসাহব্যঞ্জক শৈলীতে রচনা করান। সমাজে উৎপীড়ন সৃষ্টিকারী রাক্ষসদের দমনকারী বিষ্ণুর চব্বিশ অবতারের কথা, শাস্ত্রধর্মের বিকাশকারী মহাপুরুষ; বাল্মীকি, শুক্রাচার্য, কালিদাসের জীবনী এবং যোগসাধনা, আত্মবিকাশ ও আত্মবিজয়ের জন্য দত্তাত্রেয় ও পারসনাথকে রুদ্রের অবতাররূপে অঙ্কিত করে মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথ দেখিয়েছেন। সমাজে আধ্যাত্মিক দিশা দানের জন্য শব্দব্রহ্ম রূপে শ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবকে গুরুর আসনে বসিয়েছেন এবং সমাজকে নেতৃত্বদানের জন্য পঞ্চপ্যারের পরম্পরাসহ খালসা পন্থকে বিশিষ্ট স্থান দিয়েছেন। দেশ ও ধর্ম রক্ষার জন্য তিনি সমাজে ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্রশক্তির সম্মিলন ঘটিয়েছেন। আদর্শ নেতারূপে জীবনের সমস্ত শ্রেয় তিনি সমাজকেই দিয়েছেন।

(লেখক রাজস্থান সরকারের অবসরপ্রাপ্ত অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং বর্তমানে রাষ্ট্রীয় শিখসঙ্গতের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ)

‘সরবংশ দানী’ গুরুগোবিন্দ সিংহ

প্রকাশ সিংহ অটল

শিখগুরু পরম্পরার দশমগুরু গুরুগোবিন্দ সিংহের জন্ম বিহারের পাটনা শহরে পৌষশুক্লা সপ্তমী তিথিতে ১৭২৩ সংবতে (ইং ২২ ডিসেম্বর, ১৬৬৬) হয়। পিতা নবম গুরু শ্রীগুরু তেগবাহাদুর এবং মাতা গুজরীদেবী। পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত পাটনা শহরে থাকেন, তারপর মাতা-পিতা-সহ পরিবারের সঙ্গে পঞ্জাবে চলে যান। যখন তাঁর নয় বৎসর বয়স তখন কাশ্মীর থেকে একদল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কৃপারামের নেতৃত্বে গুরু তেগবাহাদুরের কাছে আসেন এবং বলেন, ‘ঔরঙ্গজেব আমাদের জোরপূর্বক অত্যাচার করে মুসলমান করতে চাইছে। কৃপা করে আমাদের ধর্ম এবং জীবন রক্ষা করুন।’ গুরুজী এই সমস্যার কথা ভাবনা-চিন্তা করে বলেন এই ধর্মান্ধতা বন্ধ করার জন্য এবং নিজেদের ধর্ম রক্ষা করার জন্য এমন একজন আধ্যাত্মিক পুরুষকে প্রাণ বলিদান দিতে হবে, যার সমাজে মান্যতা আছে। তখন তাঁর পুত্র গুরুগোবিন্দ সিংহ বলেন, ‘‘পিতাজী আপনি স্বয়ং এই সৎকার্যের জন্য উপযুক্ত একজন ব্যক্তি এবং এই পুণ্যকাজের সুযোগ আর আপনার জীবনে আসবে কিনা জানি না।’’ তেগবাহাদুর পুত্রের এই কথা শোনার পর বুঝে গেলেন তাঁর মৃত্যুর পর শিখ গুরু পরম্পরা গোবিন্দ সিংহ ভালোভাবেই নির্বাহ করতে পারবে। তিনি আগত ব্রাহ্মণদের রক্ষার ভরসা দিলেন এবং বললেন— ঔরঙ্গজেবকে গিয়ে বল যদি তুমি আমাদের গুরুকে ইসলাম গ্রহণ করাতে পারো তাহলে আমরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করবো। তারপর ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকে শাহি ফরমান আসার পর তিনি দিল্লি দরবারে যান। নিজ ধর্ম রক্ষার জন্য জীবন বলিদান দেন কিন্তু ইসলাম স্বীকার করেননি। এই রকম ভাবেই গুরুগোবিন্দ সিংহ বাল্যকালেই পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

গুরুজীর পিতা জীবিতকালেই উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং সেটা গুরুজী নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধকলাও শিখতে শিখতে বাল্যকাল থেকেই বীরভাব মনের মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে ধর্মরক্ষায় তা কাজে লাগান।

হাজার বছর ধরে শোষিত, পীড়িত হিন্দু জাতির রক্ষার জন্য গুরুগোবিন্দ সিংহ সংকল্প গ্রহণ করে খালসা পন্থ গঠন করেন। গুরু নানকদেবের শুরু করা নির্গুণ পন্থের মাধ্যমে পূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রাপ্তির যে উদ্দেশ্য তা পূর্ণ করেন। এই রকম ভাবে এমন এক শক্তি নির্মাণ করেন যার মধ্যে ধর্ম-সমাজ-রাষ্ট্র রক্ষার জন্য সন্ত ও সিপাহি দুটো গুণের সমন্বয় রয়েছে। অর্থাৎ গুরুজী ভক্তি এবং শক্তির এক অদ্ভুত সমন্বয় করেছেন। এই মহান কার্য গুরুগোবিন্দ সিংহ পঞ্জাবের কেশগড় (আনন্দপুর) জেলায় রোপড় নামক স্থানে শুরু করেন। এই সময়ে তাঁর আহ্বানে নির্ভীক এবং ভক্ত শিখেরা গুরুজীর তৈরি করা খালসা বাহিনীতে যুক্ত হন এবং খালসা উপাধি পান। খালসা শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ, পবিত্র। ওই দিন থেকেই খালসাদের জন্য ‘পঞ্চ ক’ অর্থাৎ কেশ, কাছা, কঙ্গী, কড়া এবং কৃপাণ এই পাঁচটির ব্যবহার অনিবার্য হয়।

তিনি খালসা শিখেদের অস্ত্র চালনা, যুদ্ধকলা শেখা এবং ধর্মযুদ্ধের জন্য নিজেকে বলিদান করার জন্য প্রেরণা দিয়েছেন। বর্বর ধর্মান্ধ মুঘল শাসকের নিরন্তর অমানুষিক অত্যাচার পীড়িত হিন্দুজাতির ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার সংকল্প গুরুজী খালসার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। খালসা কোনো জাতি বিশেষ, ক্ষেত্র বা স্থান বিশেষ অথবা কোনো আলাদা সংগঠন নয়। গুরুজী খালসাদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন— যে দুর্বল যার উপর অন্যায় হচ্ছে, যার কোনো রক্ষাকর্তা নেই, দলিত-অপমানিত ব্যক্তিদের সহায়তা করা— রক্ষা করা তাদের কর্তব্য। কাউকে ভয় না করা এবং কাউকে ভয় না দেখানো। কখনও কারোর ভয়ে পালিয়ে না যাওয়া। ভিক্ষা না করা— দান গ্রহণ না করা। শরীর-মন-বাণী এবং কর্মের মাধ্যমে ধর্ম এবং আচরণকে শ্রেষ্ঠ স্থানে রাখা। স্তুতি-নিন্দা ইত্যাদি থেকে বাঁচা, সমস্ত প্রকার নেশা থেকে মুক্ত থাকা, পরস্ত্রীকে মাতারূপে দেখা। তাঁর বাণী ছিল ‘‘মুঝে ‘শিখ প্যায়ারা নেহী, উসকী ‘রহত’ প্যায়ারী হ্যায়’’ অর্থাৎ— আমার কাছে শিখ আসল নয়। তাঁর জীবন-আচরণই আসল।

গুরুগোবিন্দ সিংহ দেশ-ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সর্বপ্রথম নিজের পিতার বলিদান দেন, তারপর ধর্মযুদ্ধে চারপুত্র, অনেক খালসা শিখ এবং নিজের বংশপরম্পরার সমস্ত পরিবারকে বলিদান দেন। এইজন্য তাঁকে ‘সরবংশ’ দানী বলা হয়। এইরকম অনুপম উদাহরণ সমগ্র বিশ্বে কোথাও পাওয়া যায় না। যদি আমরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে নিরপেক্ষ ভাবে দেখি, তাহলে দেখবো এই পূণ্য ভারতভূমিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পর গুরু গোবিন্দ সিংহের মধ্যে ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্রতেজের প্রকাশ একসঙ্গে হয়েছিল।

(লেখক রাষ্ট্রীয় শিখ সঙ্গতের সদস্য)

খালসা পন্থ প্রতিষ্ঠাতা
গুরুগোবিন্দ সিংহ

সর্দার চিরঞ্জীব সিংহ

পিতা তথা গুরু তেগবাহাদুরের বলিদানের পর গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখ পন্থকে নতুন দিকদর্শন করার জন্য মনস্থির করেন। এতদিন পর্যন্ত অহিংসার পথে শান্তিপূর্ণভাবে হুতাত্মা হয়ে প্রাণ বিসর্জনের পরম্পরা ছিল, এখন গুরু গোবিন্দ সিংহ সশস্ত্র সংঘর্ষের জন্য কঠোর প্রতিজ্ঞা করেন। পরবর্তীকালে ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে যে দেশ-ধর্মের শত্রুকে উপযুক্ত ভাবে পরাজিত করার জন্য সশস্ত্র সংঘর্ষের প্রতিজ্ঞা গুরু গোবিন্দ সিংহের জীবনে এক প্রধান প্রেরণা হয়ে উঠেছিল। তাঁর তরুণ জীবন শিখ জগতে এক নবীন আশার সঞ্চার করেছিল। বীরভাব তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়।

পাশাপাশি প্রাচীন সংস্কৃত রচনার ভাবধারা নিয়ে গুরুজী যে শিখ-খালসার মধ্যে এক নবচেতনার উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছিলেন এটি অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু তিনি এটাও অনুভব করেন যে কিছু বিদ্বান বা কবিদের দ্বারা লোকভাষাতে গ্রন্থগুলির অনুবাদ করালেই সব কিছু হবে না পরন্তু সেগুলির গভীর অধ্যয়নও প্রয়োজন। এইজন্য তিনি পাঁচজন শিখকে বিধিবদ্ধ ভাবে সংস্কৃত শিক্ষা প্রাপ্তির জন্য কাশী প্রেরণ করেন। এই পাঁচজন হলেন যথাক্রমে করমসিংহ, গণ্ডাসিংহ, বীরসিংহ, সৈমাসিংহ এবং রামসিংহ। এদের তিনি ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণের জন্য আদেশ দান করেন। আজও নির্মল সন্তগণ ব্রহ্মচারীর পরম্পরার ঐতিহ্য বহন করে আসছে যার শুভারম্ভ গুরুগোবিন্দ সিংহ করেছিলেন। নির্মল সন্তগণ গুরুবাণী এবং বেদবাণীতে বিদ্বান। এই নির্মল পরম্পরার উপর ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। অপর দিকে শিখদের খালসা রূপ দানের সিদ্ধান্ত গুরুজী গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে এই খালসাদের উপর ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়। শিখ সম্প্রদায়ের নবজীবন প্রদানের জন্য খালসা বাহিনীর নির্মাণ এক অতুলনীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দের বৈশাখী উৎসবে এক বিশাল সম্মেলনের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সর্বত্র নিমন্ত্রণ পত্র ও আদেশনামা প্রেরণ করা হলো। সমগ্র দেশ থেকে দলে দলে সঙ্গত আনন্দপুরে জমায়েত হতে লাগল। প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিক একমত যে ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে বৈশাখী উৎসবের দিন কেশগড়ে (আনন্দপুরের দুর্গ) প্রায় ৮০ হাজার জনতার সমাগম হয়। সামিয়ানা টাঙিয়ে তার মধ্যে এক সুন্দর মঞ্চ প্রস্তুত করার হয়। সংকীর্তনের পর দশম গুরু এক আশ্চর্যকর ঘটনা প্রস্তুত করার জন্য সৈনিক বেশে সুসজ্জিত হয়ে হাতে খোলা তরবারি নিয়ে সংগতের সম্মুখে উপস্থিত হন। এক সংক্ষিপ্ত উত্তেজক ভাষণ দানের পর তিনি গর্জে উঠে বললেন— আজ দেশ ধর্ম রক্ষার জন্য আমার শস্ত্রের আবশ্যকতা নাই পরন্তু প্রয়োজন শিখদের মস্তকের, কেবলমাত্র শিখদের মস্তক চাই। সমস্ত সভাতে এক অদ্ভুত নীরবতা দেখা গেল। কেউ বুঝতে পারছেন না যে গুরুর এ কী হলো। আবার গর্জে উঠলেন আমার শিখদের মাথা চাই কেবলমাত্র মাথা। কিছু দৌড়ঝাঁপ শুরু হলো— কয়েকজন মাতা গুজরীদেবীর কাছে গিয়ে অনুরোধ জানাল যে তিনি যেন গুরুজীকে বুঝিয়ে বলেন নচেৎ শিখদের অনিষ্ট হবে। কিন্তু গুরুজীর ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করতে মাতা গুজরীদেবী অস্বীকার করলেন।

অপরদিকে গুরুজী স্থিরকণ্ঠে পুনরায় মস্তকের চাহিদার কথা জানাতেই থাকলেন। আসলে শিখগণ বুঝতে পারলেন যে তাদের পরীক্ষার সময় এসে গেছে। এই পরীক্ষায় আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে। সেজন্য লাহোরের দয়ারাম খত্রী হাত জোড় করে গুরুজীর কাছে এসে বললেন— ‘‘গুরুদেব, দাসের মস্তক উপস্থিত হয়েছে। গুরুজী দয়ারামকে পাশের কক্ষে নিয়ে গেলেন। ভীত ত্রস্ত সংগতগণ কর্তনের শব্দ শুনতে পেল— কক্ষের নালী দিয়ে প্রবাহিত রক্তধারা তাদের দৃষ্টিগোচর হলো। তারপরই গুরুজী রক্তরাঙা তরবারি হাতে নিয়ে সকলের সামনে এসে আবার উচ্চকণ্ঠে বললেন— আরও মাথা চাই। দ্বিতীয়বার হস্তিনাপুরের জাঠ ধর্মদাস করজোড়ে গুরুজীর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। গুরুজী তাঁকেও ভিতরে নিয়ে গেলেন ও একই ভাবে পুনরায় ফিরে এলেন এবং গর্জন করে বললেন আরো মাথা চাই। দ্বারকাপুরী থেকে আগত ধোপা মোহকমচন্দ গুরুজীর সামনে এলেন। পূর্বের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। আবার কিছুক্ষণ নীরবতা লক্ষ্য করা গেল। গুরুজীর কণ্ঠস্বর আরও

উত্তেজিত হলো—

হ্যায় কই শিখ বেটা, জো করে শীশ ভেটা,

বে-অন্ত শীশ চাহিয়ে, সো জলদ জলদ আইয়ে।

এরপর কর্ণাটকের বিদর থেকে আগত নাপিত সাহেব চন্দ সামনে এলেন এবং সর্বশেষে ওড়িশার জগন্নাথপুরী থেকে আগত হিম্মত রায় ভিস্তি (জলবাহক) সামনে গেলেন। কিছুক্ষণ গুরুজী কক্ষের মধ্যে অবস্থান করার পর পাঁচ জন শিখকে নতুন গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়ে মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়ে সবার সামনে নিয়ে এলেন। তখন আরও শিখ মাথা দেবার জন্য এগিয়ে আসতে লাগলেন। কিন্তু গুরুজী তাই দেখে কঠোর কণ্ঠে বলে উঠলেন— 'গুরুজীর দক্ষিণা গ্রহণ পূর্ণ হয়ে গেছে। অমৃত পান করে এই শিখগণ সিংহে রূপান্তরিত হয়েছে। খালসা অর্থাৎ শুদ্ধ রূপ এরা আমার পাঁচ প্রিয়জন যাদের মধ্যে আমি সব সময় নিবাস করব।

''খালসা মেরে রূপ হ্যায় খাস,

খালসহ মহি হউ করহুঁ নিবাস।''

এদের ইচ্ছাই আমার কাছে আজ থেকে আজ্ঞা স্বরূপ। কিছুক্ষণ পরে গুরু গোবিন্দ সিংহ নতুন কৌতুকের অবতারণা করলেন। পঞ্চ প্যারে (প্রিয়জন)-কে উঁচু সিংহাসনে বসিয়ে নিজে বীরাসনে করজোড়ে তাদের সামনে বসে বিনম্রভাবে বললেন— 'গুরুরূপ খালসা মহোদয়, আপনারা পবিত্র হয়েছেন। আপনারা আমাকেও পবিত্র করুন, আমাকেও অমৃত (সরবত) পান করান।' এর পূর্বে গুরুজী পঞ্চ প্যারের সামনে একটি বড় পাত্রে জল ভরে রেখে খড়্গ সঞ্চালন করেছিলেন, মাতৃদেবী মিষ্টি বাতাসা জলের মধ্যে দিয়ে অমৃতকে মিষ্ট করেন। ওই একই পাত্রে মিষ্টি অমৃত পাঁচ জনকে পান করানো হয় অর্থাৎ জাত-পাতের বিভেদ নষ্ট করেন, শিখদের বীরযোদ্ধা সন্ন্যাসী এবং সৈনিক রূপে তৈরি করেন। এখন তাকেই সেই অমৃত পান করানোর জন্য দয়া সিংহকে বিনম্র প্রার্থনা জানান, দয়াসিংহ সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। কিন্তু জানতে চাইলেন— ''সৎ সন্ন্যাসী আপনি তো আমাদের মাথা নিয়ে অমৃত পান করিয়েছেন, এখন আপনি খালসাকে কী যৌতুক দেবেন?'' করজোড়ে গুরুজী উত্তর দিলেন ''আমি আমার চার পুত্রকে খালসার কাছে যৌতুক রাখলাম।''

''খালসা কে প্রসাদি করি, সূত বিত কোস ভণ্ডারু,

রাজমাল সাদন সকল পুত্র কলিত্র বিওহার।''

তারপর পঞ্চ প্যারে গুরু গোবিন্দ রায়কে প্রথম অমৃত পান করান। গোবিন্দ রায়কে সিংহ উপাধিতে ভূষিত করেন, এবং তারপর সংগতদের অমৃতপান করানো হয়।

খালসা অকাল পুরুষের প্রতীক— যুদ্ধ জয়ের কারণ স্বরূপ শ্রীগুরু। পাঁচবার জয়ধ্বনি দেওয়া হয়—

বাহে গুরুজী কী ফতেহ্, বাহে খালসা কী ফতেহ্।''

যুগের এই কৌতূহলপূর্ণ অতুলনীয় ঘটনা কখনো হয় নাই, আর হবেও না। গোবিন্দসিংহ সত্যসত্যই শকারি বিক্রমাদিত্যের মতো মৃতবৎ সমাজকে পুনরায় চিরঞ্জীবী করে গেলেন।

এক স্বর্গীয় সনাতনধর্মী সন্ত বলেছেন— ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দের বৈশাখীতে যে খালসার জন্ম হয়েছে তা পরবর্তীকালে হিন্দুর পুনর্জাগরণ ঘটাবে। আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই যে ৮০০ বছরের প্রাচীন বিদেশি মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়েছে খালসাদের তেজময় বীরত্ব।

১৭০৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ অক্টোবর তিনি তাঁর এক শিষ্যকে 'আদি গ্রন্থ' আনতে বলেন। শ্রী আদি গ্রন্থের সামনে পাঁচ পয়সা ও নারিকেল রেখে 'মেরা রূপ গ্রন্থ হি জ্ঞান ইসমে ভেদ নহী কছু মান'— এই কথা বললেন। শ্রী আদি গ্রন্থ পরিক্রমা করে মস্তক নত করলেন। তিনি এই ঘটনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন যে আজ থেকে আদিগ্রন্থই গুরুস্থানে বিরাজমান হবে এবং গুরু গ্রন্থসাহেব নামে পূজিত হবে। 'আমি খালসাতে বিলীন হতে চলেছি' বললেন। তিনি আরও বললেন যে সাংসারিক সিদ্ধান্তের জন্য পাঁচ শিখ একত্রিত হয়ে নির্ণয় গ্রহণ করবে। গুরুজী স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত প্রদান করেন যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য শিখদের সম্মেলনের আহ্বান করা দরকার। সম্মেলনে পাঁচ শিখের মতামতকেই গুরুর মত মেনে নিয়ে তাকেই পালন করা কর্তব্য, কারণ ওই পঞ্চ প্যারের মধ্যেই তিনি অবস্থান করবেন।

একদিন যে দশম পিতা পাটনাতে জন্মগ্রহণ করে জীবনযাত্রা প্রারম্ভ করেছিলেন তার সমাপ্তি ঘটে মহারাষ্ট্রের নান্দেড় গ্রামে। এক দিব্য জ্যোতি মহাজ্যোতিতে বিলীন হলো।

মৃত্যুর পূর্বে গুরু গোবিন্দ সিংহ ঘোষণা করেছিলেন যে এরপর গুরু গ্রন্থই গুরুরূপে বিবেচ্য হবেন। তখন থেকেই শিখ জগতে মানব গুরুর পরম্পরা সমাপ্ত হয়ে গেছে।

এই ঐতিহাসিক নির্ণয়ের পরই গুরুপদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অংশ গুরুগ্রন্থের মধ্যেই সমাবিষ্ট হয়েছে এবং পার্থিব অংশ খালসার মধ্যে বিলীন হয়ে আছে। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরের জন্য গুরুমত গ্রহণের পদ্ধতি এখন লোকতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে নিহত হয়েছিল।

কিন্তু এই যুক্তি অত্যন্ত তুচ্ছ। বাস্তব পক্ষে পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মতামত গ্রহণের পক্ষে ছিলেন গুরু গোবিন্দ সিংহ। জনমতকে মান্যতা দান ছিল তাঁর এক আদর্শ কার্যশৈলী। পঞ্চ প্যারের কাছে স্বয়ং গুরুজী দীক্ষা গ্রহণ করেন, অমৃতপান করেন। দীক্ষিত খালসাকে তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন। চমকৌর থেকে বহির্গত হবার পূর্বে পাঁচ শিষ্য তাঁকে অভিবাদন করেন। বান্দা বাহাদুরকে জাঠেদার তৈরির পূর্বে তিনি তাঁর পরিবারের পাঁচ সভাসদের মতামত গ্রহণ করেন, যদিও তিনি বান্দা বাহাদুরকে নেতৃত্বে দানের সিদ্ধান্ত পূর্বেই গ্রহণ করেছিলেন এবং বান্দা বাহাদুরের মনও সেইভাবে তৈরি করেছিলেন। এ সবই গুরুজীর গণতান্ত্রিক কার্যশৈলীর পরিচায়ক। এই জন্যই গুরুজী গুরুগ্রন্থসাহেবকে গুরুপদে অভিষিক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

(লেখক রাষ্ট্রীয় শিখ সঙ্গতের প্রাক্তন রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ)

স্যমন্তক থেকে কোহিনূর

সন্দীপ চক্রবর্তী

কেউ কেউ মনে করেন বিখ্যাত হিরে কোহিনুর আসলে কৃষ্ণের স্যমন্তক মণি। তাদের ভাবনায় একেবারেই কোনো সারবত্তা নেই একথা বোধহয় বলা যাবে না। ইতিহাস যদিও নীরব কিন্তু ফরাসি ব্যবসায়ী জঁ ব্যাপটিস্ট ট্যাভার্নিয়ে এই প্রসঙ্গে মূল্যবান আলোকপাত করেছেন। মুঘলদের দখলে থাকা মূল হিরেটি তিনি দেখেছিলেন। তার ওজন ছিল ৭৯৩ ক্যারেট। পরে তা দুটি হীরকখণ্ডে ভাগ করা হয়। যার একটি কোহিনূর। অন্যটি অর্লভ। কোহিনূর এখন ব্রিটেনের রানির মুকুট অলঙ্কৃত করছে আর অর্লভ রয়েছে রাশিয়ার ক্রেমলিন ডায়মন্ড ফান্ডে। রাশিয়ার বিখ্যাত রত্নবিশেষজ্ঞ আলেকজান্ডার ফার্শস্যানও কোহিনূর এবং অর্লভ দেখার পর মন্তব্য করেছিলেন দুটি হিরে একে অপরের সহোদর। অর্থাৎ কোনো একটি মূল থেকে দুটি হিরের জন্ম হয়েছে। সম্ভবত ওই মূল হিরেটিই ছিল স্যমন্তক মণি। অনেকে মনে করেন স্যমন্তক মণি দুটি নয়, অনেকগুলি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছিল। তাঁদের মতে স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটে রাখা হোপ ডায়মন্ডও স্যমন্তক মণির অঙ্গ। এ ছাড়া ভারতেও স্যমন্তকের অংশবিশেষ কারও কারও কাছে থাকতে পারে।

যাই হোক, এবার আমরা ফিরে যাব ইতিহাসের আঙিনায়। খুঁজে দেখার চেষ্টা করব কোহিনূরের যাত্রাপথটি। কোহিনূরের আদি ইতিহাস সম্বন্ধে কোনো তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে, দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন মন্দিরগুলির দলিলপত্র থেকে এটা জানা গেছে ১৩ শতকে কাকাতীয় সাম্রাজ্যের অধীন ভদ্রকালী মন্দিরে অনুরূপ একটি হিরে ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হিরেটি কাকাতীয়দের কাছে আসার আগে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং সম্রাট অশোক তার অধিকারী ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকাল ৩২১ থেকে ২৯৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল ১২৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে। অনেকে মনে করেন কৃষ্ণের দেহত্যাগের পর স্যমন্তক মণি রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। তারপর বহু হাত ঘুরে কাকাতীয় সম্রাটদের হাতে এসে পৌঁছয়। ১৪শ শতকে দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি দক্ষিণ ভারত আক্রমণ করে কাকাতীয় সম্রাটকে পরাজিত করেন। খিলজির সেনাপতি মালিক কাফুরের নেতৃত্বে ১৩১০ সালে ওয়ারঙ্গল শহরে ব্যাপক লুঠতরাজের সময় ভদ্রকালী মন্দির থেকে চুরি হয়ে যায় হিরেটি।

খিলজিদের পর দিল্লির সব সুলতানই হিরেটির মালিকানা ভোগ করেছে। তারপর ১৫২৬ সালে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর বাবরের হস্তগত হয়েছে। বাবর হিরেটিকে বলতেন, 'বাবরের হিরে'। যদিও যারাই হিরের মালিকানা ভোগ করেছেন প্রত্যেকেই পছন্দমতো নাম দিয়েছেন, কেউ কেউ লিখেও গেছেন তাদের অনুভূতির কথা। কিন্তু কোনো এক দুর্বোধ্য কারণে ভারতের ইতিহাসবিদরা মুঘলদের কথাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন।

হিরেটির উৎস প্রসঙ্গে আরও একটি মত সবিশেষ প্রচলিত। কেউ কেউ মনে করেন ১৬৫০ সালে গোলকুণ্ডার হীরকখনি থেকে প্রাপ্ত হিরেটি মির জুমলা শাহ্জানহানকে উপহার দিয়েছিলেন। এরপর শাহজাহান তাকে তার বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসনে স্থাপন করেন। পরে শাহজাহানকে আগ্রা দুর্গে বন্দি করে ঔরঙ্গজেব সম্রাট হন। হিরে তার হস্তগত হয়। তখনকার বিখ্যাত পাথর খোদাই শিল্পী হর্টেনসো বর্জিয়াকে তিনি হিরেটি কাটিং ও পালিশ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্জিয়ার অসাবধানতায় ৭৯৩ ক্যারেটের হিরে ১৮৬ ক্যারেটে রূপান্তরিত হয়। এর জন্য নাকি ঔরঙ্গজেব বর্জিয়াকে রীতিমতো ভর্ৎসনা করেছিলেন। তার দশ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছিল। আধুনিক গবেষণায় বর্জিয়ার হিরে কাটিঙের গল্প মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে। সম্ভবত এই সময়েই হিরেটি কাটিঙের নামে ভাগ করা হয়েছিল। কোহিনূর এবং অর্লভ এই ভাগাভাগিরই ফসল।

মুঘল শাসনের শেষ দিকে ১৭৩৯ সালে পারস্যের অধিপতি নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেছিল। মুঘলদের প্রায় কচুকাটা করে নাদির শাহ দারিয়া-ই-নূর ময়ূর সিংহাসন কোহিনূর-সহ সর্বস্ব লুট করেছিল।

কোহিনূর নাম নাদির শাহেরই দেওয়া। যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় আলোর পাহাড়। ১৭৪৭ সালে নাদির শাহ আততায়ীর হাতে নিহত হলো। সেই সঙ্গে ভেঙে পড়ল তার সাম্রাজ্য। কোহিনূর চলে গেল তার সেনাপতি আহমদ শাহ্ দুরানির হাতে। পরবর্তীকালে দুরানি হয়ে উঠল আফগানিস্তানের শাসক। তার উত্তরসূরিদের মধ্যে অন্যতম শাহসুজা দুরানি ১৮০৮ সালে পেশোয়ারে মাউন্টসুয়ার্ট এলফিনস্টোনের আগমন উপলক্ষে হাতে একটি ব্রেসলেট পরেছিলেন। যার শোভা বর্ধন করেছিল কোহিনূর। এক বছর পর, আফগানিস্তানে রাশিয়ার সম্ভাব্য আগ্রাসন অনুমান করে সুজা ব্রিটেনের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে। কিন্তু লাভ কিছু হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই তার অগ্রজ মহম্মদ শাহ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে লাহোরে চলে যায় সুজা। কোহিনূরকে সঙ্গে নিতে অবশ্য ভোলেনি। লাহোরেই তার সঙ্গে দেখা হয় শিখ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ রণজিৎ সিংহের। তাঁর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে সুজা কোহিনূর উপহার দেন রণজিৎ সিংহকে। সেটা ১৮১৩ সাল। শেষ বয়েসে মহারাজ রণজিৎ সিংহ উইল করেছিলেন। তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছিল, তাঁর মৃত্যুর পর কোহিনূর থাকবে পুরীর জগন্নাথদেবের হেফাজতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ব্রিটিশ শাসকেরা সেই উইল কার্যকর করতে দেয়নি। দ্বিতীয় ব্রিটিশ-শিখ যুদ্ধে শিখদের পরাজয়ের পর শিখ সাম্রাজ্য ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলো। তৎকালীন শিখ সম্রাট মহারাজা দলীপ সিংহ তখন বারো বছরের কিশোর। লাহোর চুক্তি করতে তাকে বাধ্য করা হলো। সেই চুক্তি অনুযায়ী কোহিনূর চলে গেল ইংল্যান্ডে। রানি ভিক্টোরিয়ার মুকুটের শোভা বর্ধন করতে। মহারাজ রণজিৎ সিংহের অন্যান্য সম্পত্তি জোর করে দখল করল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

অন্যায় ভাবে কোহিনূর দখল করার জন্য নিজের দেশেও সমালোচিত হয়েছিলেন লাহোর চুক্তির উদগাতা ডালহৌসি। সম্ভবত তিনি রানিকে কোহিনূর (যার বর্তমান বাজারদর ৭০০০০ কোটি টাকা) উপহার দিয়ে নিজের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। যদিও তার যুক্তি ছিল কোহিনূর যুদ্ধজয়ের প্রাপ্তি। যেহেতু পরাজিত সম্রাটের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি বিজয়ীকে উপহার দেবার রীতি রয়েছে সেই জন্যেই কোহিনূর হস্তগত করে রানিকে উপহার দেওয়া হয়। যাই হোক, যুদ্ধের স্মারক হিসেবে কোহিনূর যে চাঞ্চল্য সে সময় সৃষ্টি করেছিল তার তুলনা বিশ্ব-ইতিহাসে খুব কমই মেলে।

এরপর শুরু হলো কোহিনূর হস্তান্তর করার পালা। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে কর্মরত ব্রিটিশ সার্জন ড. জন লগিন (পরবর্তীকালে স্যার জন স্পেনসার লগিন) দলীপ সিংহের অভিভাবক নিযুক্ত হলেন। ১৮৪৯ সালের ৭ ডিসেম্বর ড. লগিন গভর্নর জেনারেলের হাতে কোহিনূর তুলে দিলেন। হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর অ্যাফেয়ার্স অব পঞ্জাবের প্রেসিডেন্ট স্যার হেনরি লরেন্স, সি. জি. মানসেল, জন লরেন্স এবং তৎকালীন ভারত সরকারের সচিব স্যার হেনরি এলিয়ট। ইংলন্ডে পাড়ি দেওয়ার আগে কোহিনূর লরেন্স -পরিবারের জিম্মায় ছিল। একবার নাকি জন লরেন্স তার ওয়েস্টকোটের পকেটে কোহিনূর থাকার

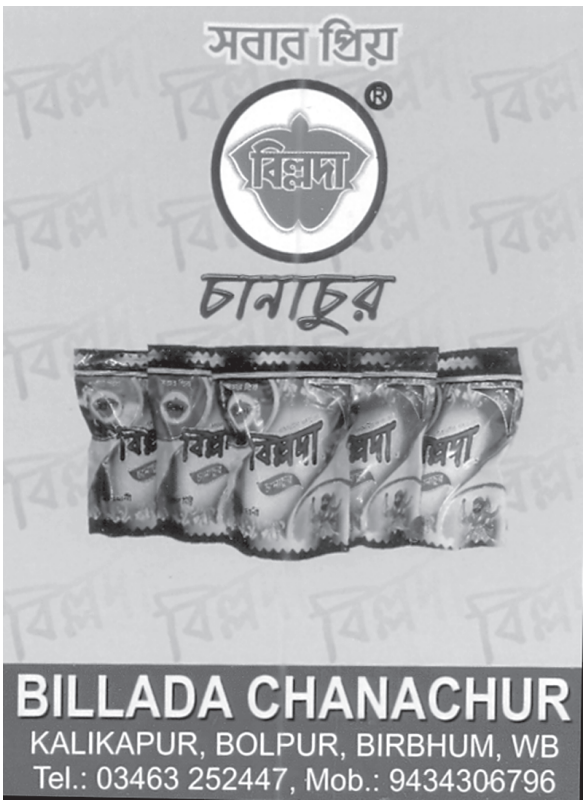

অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত

আলোচনা সভা

বিষয়

গ্রাহকের অধিকার

দিনাঙ্ক ঃ ২২ জানুয়ারি ২০১৭

স্থান ঃ ভারতসভা হল

৬২, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-১২, সময় ঃ সকাল ১০টা

প্রধান অতিথি

কেশরীনাথ ত্রিপাঠী (রাজ্যপাল, পঃ বঃ)

বিশেষ অতিথি

সাধন পাণ্ডে (মন্ত্রী, ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর, পঃ বঃ)

বক্তা

অরুণ দেশপাণ্ডে (সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি (অ ভা গ্রা প)

আহ্বায়ক

অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায় (রাষ্ট্রীয় সহ-সচিব, সংগঠন)

কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। তার খানসামা লন্ড্রিতে পাঠানোর আগে পকেট হাতড়াতে গিয়ে কোহিনূরের কথা জানতে পারে। ভারতীয় খানসামা বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। কোহিনূর ফিরিয়ে দিয়েছিল তার মনিবের কাছে।

১৮৫০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। ভারতের ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত দিন। এই দিন কোহিনূর ইংলন্ডে পাড়ি দেয়। বম্বে ট্রেজারি থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, কোহিনূর রাখা হয়েছিল একটি ছোট লোহার বাক্সে। সেই বাক্সটি মাঝখানে রেখে তৈরি হয়েছিল লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা পার্সেল। অতঃপর পার্সেলটি গালা দিয়ে সিল করে রাখা হয় একটি দুর্ভেদ্য সিন্দুকে। নিরাপত্তার ব্যবস্থাও ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষ দায়িত্ব পেয়েছিলেন ক্যাপটেন জে. রামসে এবং লেফটেন্যান্ট কম্যান্ডার এফ. ম্যাকেসন। চীন থেকে আসা জাহাজ এইচ এম এস মেডিয়া বম্বে বন্দরে অপেক্ষা করছিল। ৬ এপ্রিল জাহাজটি কোহিনূর নিয়ে ইংলন্ডে রওনা দেয়। কিন্তু যাত্রা খুব সুখের হয়নি। কয়েকদিনের মধ্যেই জাহাজে কলেরা দেখা দেয়। চিকিৎসা এবং ওষুধপত্রের আশায় মরিশাসে জাহাজ দাঁড় করানো হলো। কলেরায় আক্রান্ত রোগীদের জাহাজ তাদের বন্দরে এসেছে শুনে মরিশাসের সাধারণ মানুষ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছয় যে কামান দেগে জাহাজ ধ্বংস করে দেবার দাবি জানানো হয়। পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হয় কোহিনূরের জাহাজ। কিন্তু মরিশাস ছেড়ে কিছুদূর যাবার পরেই ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক ঝড়ের মুখে পড়ে জাহাজটি।

২৯ জুন ব্রিটেনের প্লাইমাউথ বন্দরে জাহাজ পৌঁছল। সাধারণ যাত্রীরা নেমে গেলেন। বেশিরভাগ পণ্যও খালাস করা হলো। থেকে গেল শুধু কোহিনূর। ১ জুলাই পোর্টসমাউথের স্পিটহেড বন্দরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত সচিব মি. অনসলো এসে পৌঁছলেন। তিনি রামসে ও ম্যাকেসন কোহিনূর নিয়ে ট্রেনে করে লন্ডনে গিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চেয়ারম্যান এবং ডেপুটি চেয়ারম্যানের হাতে তুলে দেন। ৩ জুলাই কোম্পানির ডেপুটি চেয়ারম্যান আনুষ্ঠানিকভাবে কোহিনূর রানির হাতে তুলে দেন।

১৮৫১ সালে লন্ডনের সাধারণ মানুষ যাতে কোহিনূরকে চাক্ষুষ করতে পারেন তার জন্য এক বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। ইতিহাসে এই প্রদর্শনী গ্রেট একজিবিশন নামে খ্যাত। লন্ডনের বিখ্যাত সংবাদপত্র টাইমস প্রদর্শনীর খবর দিয়ে লিখেছিল : 'এই মুহূর্তে কোহিনূর প্রদর্শনীর মধ্যমণি। হিরেটির একটা অদ্ভুত রহস্যময় আকর্ষণ আছে। যার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা কঠোর করতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোহিনূরকে দেখার জন্য মানুষের উন্মাদনা বিন্দুমাত্র কমেনি। লোকে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে অধৈর্য হয়ে পড়ছে কিন্তু বাড়ি ফিরে যাচ্ছে না। যদিও কোহিনূরকে দেখতে মোটেই ভালো লাগছে না। এটা হতে পারে তার বেমানান কাটিঙের জন্য কিংবা ভুলভাল আলোকসজ্জার জন্য। শুক্রবার ও শনিবার কোহিনূরকে সব থেকে ভালো সাজসজ্জায় দেখা গিয়েছিল। একটা লাল কাপড়ে সেটি জড়িয়ে রাখা হয়েছিল। অনেকগুলো গ্যাসের আলো জ্বলছিল চারপাশে। কিন্তু এত কিছু করার পরেও কোহিনূরের সেই চমক লক্ষ্য করা যায়নি।'

বেঢপ কোহিনূরকে নজরকাড়া আকৃতি দিতে হে মার্কেটের গ্যারাড কোম্পানিতে পাঠানো হয়। কাটিঙের দায়িত্ব তারা নেন। অন্যদিকে পালিশ করার দায়িত্ব পান মাউডসলে অ্যান্ড সন্স। প্রিন্স অ্যালবার্ট এবং ডিউক অব ওয়েলিংটনের নজরদারিতে সম্পন্ন হয় পুরো প্রক্রিয়াটি। সঙ্গে ছিলেন রানির ব্যক্তিগত রত্নবিশেষজ্ঞ জেমস টেনান্ট। ৩৮ দিন ধরে কাটিং করা হয়। যার জন্য সেই সময় খরচ হয়েছিল ৮০০০ পাউন্ড। কোহিনূরের ওজন ৪২ শতাংশ কমানো হয়। ১৮৬ ক্যারেট থেকে ওজন নেমে আসে ১০৫.৬ ক্যারেটে। ওজনের এই বিপুল হ্রাস প্রিন্স অ্যালবার্টকে খুশি করতে পারেনি। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সবাই এক যোগে রায় দেন কাটিঙের কারিগর ভুরজাঙ্গারের পক্ষে। তাঁদের মতে ভুরজাঙ্গার অসামান্য দক্ষতায় কোহিনূরকে নতুন রূপ দিয়েছে। কথাটা যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ রানি ভিক্টোরিয়া যখন নবকলেবরের কোহিনূর মহারাজ দলীপ সিংহকে দেখান তখন তিনিও কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারেননি।

অতঃপর কোহিনূর রানি ভিক্টোরিয়ার ব্রোচের অঙ্গ হয়ে গেল। কোহিনূর ছিল তার ব্যক্তিগত সম্পদ, রাজপরিবারের অলঙ্কার নয়। ব্রোচটি প্রায়শ পরলেও রানি ভিক্টোরিয়া নাকি মোটেই সচ্ছন্দবোধ করতেন না! তার মনে পড়ত কোহিনূর অন্যায়ভাবে দখল করা হয়েছিল। ১৮৭০ সালে তিনি লেখেন, 'ভারত সম্পর্কে আমি যেভাবে ভাবি সম্ভবত আর কেউ সেভাবে ভাবেন না। বস্তুত আমি দেশ দখলের সমর্থক নই। এতে আমাদের কোনো উপকার হয় না। আপনারা এও জানেন কোহিনূর ব্যবহার করতে আমি কতটা অসচ্ছন্দ বোধ করি।'

রানি ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর কোহিনূর চলে যায় সপ্তম এডওয়ার্ডের স্ত্রী রানি আলেকজান্দ্রার মুকুটে। সেটা ১৯০২ সাল। তারপর ১৯১২ সালে রানি মেরির মুকুটে। ১৯৩৭ সালে যায় রানির মায়ের মুকুটে। ২০০২ সালে তাঁর মৃত্যুর তাঁরই সমাধিতে রাষ্ট্রীয় স্মারক হিসেবে রক্ষিত হয় কোহিনূর। টাওয়ার অব লন্ডনে প্রত্যেকটি মুকুট সযত্নে সংরক্ষিত। রয়েছে ১৮৫০ সালে আনা মূল কোহিনূরের একটি অবিকল কাচের প্রতিরূপও। আসলটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোনো এক গোপনস্থানে সরিয়ে ফেলা হয়। সেটি এখন কোথায় কেউ জানে না।

কোহিনূরের ইতিহাস মোটামুটি এই। সম্প্রতি ভারতের তরফ থেকে কোহিনূরকে ফিরিয়ে আনার একটা চেষ্টা শুরু হয়েছে। যদি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় তাহলে তা ভারতের পক্ষে খুবই গৌরবোজ্জ্বল একটা ঘটনা হবে। কারণ কোহিনূর মুঘলদের নয়, হিন্দু ভারতের। স্যমন্তকমণি কীভাবে কাকাতীয় রাজাদের হাতে পৌঁছল সেই ইতিহাস জানা দরকার। তার মধ্যেই রয়েছে কোহিনূরের জন্মপরিচয়। ভবিষ্যতের গবেষকেরা যেদিন এই মিসিং লিঙ্ক উদ্ধার করতে পারবেন সম্ভবত সেদিন ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অন্য এক অধ্যায় শুরু হবে। ■

পঞ্চপ্যারে

স্বধর্ম রক্ষায় শিখ সম্প্রদায়ের নবম গুরু তেগবাহাদুর আত্ম বলিদান দিয়েছেন। মুসলমান শাসক তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করেছে। এবার ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব এসে পড়লো তাঁর বালক পুত্র গোবিন্দের উপর। তখন তাঁর বয়স মাত্র এগারো বছর। তিনি হলেন শিখদের দশম গুরু। মুসলমান শাসকের অত্যাচারে দেশে তখন আতঙ্ক। মানুষ ভয়ে ভয়ে থাকে। হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান না হলে তাকে হত্যা করা হচ্ছে। এই সময় গুরুগোবিন্দ সিংহ সবাইকে ধর্ম রক্ষায় এগিয়ে আসতে আহ্বান করলেন।

গুরু তেগবাহাদুরের পারলৌকিক কাজকর্ম হয়ে যাওয়ার পর গুরু গোবিন্দ একদিন তাঁর সমস্ত শিষ্যকে ডেকে পাঠালেন। সারাদেশ থেকে হাজার হাজার শিষ্য এসে হাজির হলো। সবাই উন্মুখ হয়ে আছে, কী আদেশ দেবেন গুরুজী!

হাতে বিশাল তরবারি নিয়ে বেরিয়ে এলেন গুরু গোবিন্দ। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন— মুসলমান শাসক আদেশ দিয়েছে সবাইকে নিজের ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। এই সংকট থেকে হিন্দু ধর্মকে বাঁচাতে গুরু তেগবাহাদুর আত্ম বলিদান দিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে কে আছে যে ধর্ম রক্ষায় নিজের জীবন দিতে পারবে?

তাঁর কথা শুনে সবাই চুপ হয়ে গেল। একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো। অসংখ্য জনতার মধ্য থেকে উঠে দাঁড়ালো এক যুবক। বলল—আমি পারবো।

গুরু গোবিন্দ তাকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন। শোনা গেল আর্তনাদ। রক্তাক্ত তরবারি হাতে বেরিয়ে এলেন তিনি।

তারপর আবার বললেন— আর কে আছে যে ধর্মের জন্য নিজের প্রাণ দিতে পারবে?

উঠে এলো আর এক যুবক। তারও একই পরিণতি। ঘরের ভিতর থেকে শোনা গেল আর্তনাদ। ঘরের দরজা দিয়ে তখন রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে। শিষ্যদের চোখেও অশ্রুধারা। গুরুজী বললেন, এখন চোখের জল ঝরানোর সময় নয়, এখন রক্ত ঝরানোর সময়। লড়াই করার সময়। অনেকে বুঝতে পারছে না গুরুজী কী করতে চাইছেন। গুরুর তরবারিতে প্রাণ দিয়ে কী করে ধর্ম রক্ষা হবে? কিন্তু এই ভাবে যখন পাঁচজন যুবকের বলিদান সম্পন্ন হলো তখন সবাই উঠে দাঁড়ালো। সবাই চিৎকার করে বলতে লাগলো— ধর্মের জন্য আমরা সবাই প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

গুরু গোবিন্দ প্রসন্ন হলেন। সবাইকে শান্ত করলেন। ভক্তরা সবাই বিস্মিত হলো তার পরের ঘটনায়। তাঁর আদেশে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বলিপ্রদত্ত সেই পাঁচ যুবক। তাদের পরনে সাদা কাপড়, মাথায় পাগড়ি, হাতে তরবারি। গুরুজী আসলে সেই পাঁচ যুবকের বলি দেননি। বলির অভিনয় করে তিনি পরীক্ষা করে নিতে চাইছেন ধর্মের জন্য জীবন দিতে তাঁর শিষ্যরা প্রস্তুত কিনা। সেই পাঁচ যুবককে সামনে দাঁড় করিয়ে তিনি বললেন— এই পাঁচ যুবক ধর্মের জন্য সমর্পিত হয়েছে, এরা পঞ্চপ্যারে। এদের নেতৃত্বেই আগামীদিনে আমারা নিজেদের ধর্ম রক্ষার লড়াই করবো।

গুরু গোবিন্দ সিংহের তরবারিতে তখনও রক্ত লেগে আছে। সেই তরবারির ডগা দিয়ে তিনি অমৃত (সরবত) তৈরি করে সবাইকে পান করালেন এবং পঞ্চপ্যারের হাতে নিজে পান করলেন এবং বললেন, আজ থেকে আমাদের পদবি 'সিংহ'। আমরা হলাম খালসা। পঞ্চপ্যারেকে সামনে রেখে সবাই হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলো।

শিখ সম্প্রদায়ে এই প্রথা এখনো আছে। এই প্রথাকে বলে খালসা প্রথা। গুরু গোবিন্দ সিংহ খালসা প্রথার সূচনা করে ধর্ম রক্ষার নতুন দিক দেখিয়ে গেছেন।

ত্রিদিব সোম

ভারতের পথে পথে

গির অরণ্য

গুজরাটের গির অরণ্য সিংহের একমাত্র বাসভূমি হিসেবে পরিচিত। ভারতের কেবলমাত্র এই অভয়ারণ্যেই সিংহ দেখা যায়। আফ্রিকার পরই এই অরণ্য সিংহের মুক্ত বিচরণভূমি হিসেবে পরিচিত। গির যেন সিংহের নিজের বাড়ি। এই অরণ্যের আয়তন ১৪২৪ বর্গকিলোমিটার। সিংহ ছাড়াও এখানে আরো বিভিন্ন প্রজাতির সরীসৃপ প্রাণী ও পাখি দেখা যায়। হরিণ, নীলগাই ছাড়াও লম্বা লেজওয়ালা হনুমান চোখে পড়ে। অনেকে জানেন এই অরণ্য ভারতের একটি অন্যতম পক্ষী নিবাস। বাজপাখি, জংলি ময়না, কাঠঠোকরা দেখতে হলে গির অরণ্যে যেতে হবে। এছাড়াও একটি কুমির সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়া হয়েছে। পর্যটকদের জন্য অক্টোবর থেকে জুন পর্যন্ত এই অরণ্য ঘুরে দেখার অনুমতি রয়েছে। গির অরণ্য গুজরাট ও ভারতের একটি অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র।

এসো সংস্কৃত শিখি

एवं भवितुम् अर्हति।
এরকম হতে পারে।
कदाचित् तावदपि स्यात्।
কখনো ওই রকমও হতে পারে।
किम् अहं तावदपि न जानामि?
কী, আমি তাও জানি না?
कः न इच्छति?
কার ইচ্ছা নেই/কে চায় না?
तत्र गत्वा किं करोति?
সেখানে গিয়ে কী করবেন?

ভালো কথা

ফুটপাতে স্কুল

আমি প্রতিদিন বিবেকানন্দের বাড়ির সামনে দিয়ে স্কুল থেকে ফিরি। ওখানে ফুটপাতে অনেক পরিবার আছে। তাদের অনেক ছেলেমেয়ে। কিন্তু ওরা স্কুলে যায় না। কয়েক মাস ধরে দেখছি ওদেরকে কয়েকজন দাদা দিদি পড়াচ্ছে। বিকেলবেলা ফুটপাতে বসে কেউ অঙ্ক করাচ্ছে, কেউ ইংরেজি পড়াচ্ছে আবার একদিন দেখি এক দিদি খেলা করাচ্ছে। বিস্কুট খাওয়ার খেলা। এখন সপ্তাহের দু' তিন দিন ফুটপাতে ওদেরকে ওই দাদা-দিদিরা পড়ায়।

সুতনু সেন, ষষ্ঠ শ্রেণী, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) চ র না ব	(১) র উ ণ ত্ত
(২) স ন পু র্বা	(২) রা প ম্প র

৯ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) সিন্ধুঘোটক (২) সমাজসেবা	(১) অপরাজিতা (২) রজনীগন্ধা

উত্তরদাতার নাম

(১) শঙ্খশুভ্র দাশ, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, (২) শ্রেয়সী ঘোষ, অমৃতি, মালদা (৩) রূপসা দেবনাথ, বিরাটি, কলকাতা-৪৯, (৪) ঋকদীপ কর্মকার, কালিয়াচক, মালদা

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

মহিলাদের ‘আশা’

অঙ্গনা

সুতপা বসাক ভড়

পশ্চিমবাংলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কত যে অশিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত মানুষ কেবলমাত্র নিজেদের অজ্ঞানতার জন্য শারীরিক এবং মানসিক অসুস্থতার শিকার হয়ে পড়েন তা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। এরা নিজেদের শারীরিক অসুস্থতার কথা কাউকে বলতে পারেন না। ডাক্তার

এক আশা-কর্মীর কাছে পরামর্শ নিচ্ছেন গৃহবধূ।

দেখানো বা হাসপাতালে যাওয়াও এদের কাছে বেশ সঙ্কোচের ব্যাপার। এদের মধ্যে অনেকেরই এক-আধবার ডাক্তারবাবু বা তাঁর সহকারীর কাছে বকুনি খাবার অভিজ্ঞতা আছে। অনেক সময় সাহসে না কুলোলে হাতুড়ে ডাক্তার, ওঝা, তান্ত্রিকের কাছে ছোটেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর ফল ভালো হয় না। তখন আর ফেরার পথ থাকে না। এরকম মানুষদের পাশে আমাদের ‘আশা’ আছে। যাঁরা ডাক্তারবাবুর কাছে বা হাসপাতালে যেতে ইতস্তত করেন, তারা কিন্তু মহিলাদের নিয়ে গঠিত স্বাস্থ্য-সচেতনতা গোষ্ঠী ‘আশা’কে তাদের সমস্যার কথা খুলে বলেন। ট্রেনিংপ্রাপ্তা আশাকর্মীরা তাদের অসুবিধার কথা শুনে সহানুভূতির সঙ্গে চেষ্টা করেন তার সমাধান করতে। আয়ত্তের বাইরে হলে সরকারি হাসপাতালে দেখানোর পরামর্শ দেন এবং এ ব্যাপারে যথাসাধ্য সহায়তা করেন। অনেকে ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, আশার দেখানো পথে চলে জনগণ উপকৃত হয় এবং নিজেদের পুরনো সঙ্কোচের শৃঙ্খল ভেঙে যথাসময়ে চিকিৎসা করায়। ফলে সমাজের একটা বিরাট অংশ অনভিপ্রেত অসুস্থতার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে, এর কৃতিত্ব অবশ্যই আশার প্রাপ্য।

গ্রামের দিকে গর্ভবতী মহিলা, জননী ও সদ্যোজাত সন্তানের দেখাশুনা অনেকটাই আশার ওপর নির্ভরশীল। সময়মতো টিকা, ইঞ্জেকশান, ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ দেয় আশা। নিয়মিত বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের কুশলবার্তা নেয়।

আমাদের দেশের জনসংখ্যার অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে যুবসমাজ। এই যুবসমাজের একটা বিশাল অংশ অপুষ্টির শিকার। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু বিভিন্ন সমীক্ষার ফলে জানা গেছে যে শিশু, বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী থেকে শুরু করে ভারতের জনসংখ্যার একটা বিশাল অংশ রক্তাল্পতার শিকার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, যথাসময়ে সঠিক পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য এইরকম আপাত নিরীহ অসুখগুলি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে এবং ক্রমশ তা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। সেজন্য স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সচেতনতার প্রয়োজন। অথচ বিভিন্ন কাজের চাপে বা আমাদের নিজেদের অনভিজ্ঞতার জন্য আমরা সজ্ঞানে-অজ্ঞানে নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করে থাকি।

আমাদের আশা কিন্তু তার দায়িত্ব পালনে কোনো ত্রুটি রাখে না। সমস্যার সমাধানের উদ্দেশে ১২ থেকে ১৯ বছরের কিশোরী এবং কিশোরদের আয়রন ট্যাবলেট এবং ফলিক অ্যাসিড খাওয়ার জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করে। আশা কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধির হরমোনজনিত নানান পরিবর্তন সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে যথাযোগ্য পরামর্শ দেয়। আয়রন এবং ফলিত অ্যাসিড মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সহায়ক। বয়ঃসন্ধির সময়ে ওই ওষুধগুলি যথোচিত পরিমাণে খাওয়ার ব্যাপারে আশা কিশোর- কিশোরীদের অবগত করে। এইভাবে দেশের নতুন প্রজন্মকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুদৃঢ় করার কাজ আশা করে চলেছে।

সাধারণত একেকজন আশা কর্মী একেকটি দায়িত্ব প্রাপ্তা হন। প্রায় ১০০০ থেকে ১২০০ জনকে স্বাস্থ্য সচেতন করেন একজন আশাকর্মী। প্রত্যহ তাঁরা বেগুনি রঙের শাড়ি পরে, বেগুনি রঙের সাইকেল চড়ে হাতের ব্যাগটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে জনকল্যাণার্থে। তপশিলি জাতি-উপজাতি অধুষিত এলাকায় তাঁদের দায়িত্ব আরও বেশি। তাদের স্বাস্থ্যের জন্য নিজের পরিবারের কাজকর্মের ব্যস্ততার মধ্যে সময় বের করে সে দশের ও দেশের মঙ্গলার্থে কাজ করে। গরিবের কাছে তাঁরা বড়ো আপনজন। নিজ সাধ্যমত সহায়তা করে তাদের। সেজন্য বেগুনি শাড়ি ও সাইকেলে আশাকে দূর থেকে দেখে তারা খুশি হয়। নিজেদের শারীরিক সমস্যার কথা তাকে খুলে বলা যায়। কারণ তাঁরা আশা। তাঁরা পথ দেখান। ■

অর্থনীতি নিয়ে ভারতের যুগান্তকারী পরীক্ষা-নিরীক্ষা

অতিথি কলম

শ্যাম সুন্দর

৫০০ ও ১০০০ টাকার উচ্চ মুদ্রাঙ্কের অর্থ বাতিল হওয়া ও তার তাৎক্ষণিক ফলশ্রুতি নিয়ে প্রভূত আলোচনা চলছে। এই পরিবর্তনের অবশ্যই একটি তড়িৎ প্রতিক্রিয়া ও একটি সুদূরপ্রসারী ফলাফল অবশ্যম্ভাবী। নীতিগত বড় আকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কী ধরনের একের পর এক Chain reaction বা অভিঘাত অর্থনীতি ও সমাজের ওপর পড়বে তা আগাম ভবিষ্যদ্‌বাণী করা বেশ কষ্টকর। কিন্তু একটা ব্যাপার নিশ্চিত যে এই দিশায় একটি প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট খোলার সংখ্যা যেগুলিতে যথার্থ লেনদেন ও খাতায় অর্থাৎ অ্যাকাউন্টে টাকা রাখার পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। যে সমস্ত খাতা (অ্যাকাউন্ট) নতুন খোলা হবে তার মধ্যে এমন বহু সংখ্যক খাতা থাকবে যেগুলি আগে কখনই খোলা হয়নি বা খুললেও সেগুলি থাকত লেনদেনহীন। এ যাবৎ ব্যাঙ্কের সঙ্গে সম্পর্কহীন নতুন মানুষজনেরা অত্যন্ত উৎসাহের

উচ্চ অঙ্কের নগদ অর্থ বাতিল ও নতুন টাকা অর্থনীতিতে প্রবেশের ফলে দুর্নীতি নির্মূল করার পক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেওয়া হয়েছে তার নীতিনিষ্ঠতা দেখে অনেক রাজনৈতিক দলই এই স্বচ্ছতার ধারাবাহিকতার সঙ্গে নিজেদের জুড়ে নিতে পারে।

সঙ্গে কী ধরনের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধের অধিকারী তারা হতে পারে সে ব্যাপারে তৎপর হবে। শুধু তাই নয়, তারা দ্রুত অর্থনৈতিক কাজকর্মের গতিপ্রকৃতিও শিখে নিয়ে নিজেদের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করে তাদের নিজস্ব অর্থ সম্পত্তি রক্ষার চেষ্টা করবে। সংখ্যার হিসেব নিকেশ ও লেখালিখির পূর্ণ জ্ঞান রাতারাতি সকলের নিশ্চয় হয়ে যাবে না। এর ফলে অসৎ বেসরকারি ক্ষেত্রের নিয়োগকর্তারা, অনেক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ভেতরকার কিছু সংখ্যক অসাধু কর্মী ও ফড়েরা হয়তো কিছুদিন তাদের ঠকাবে। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষেরও দায়িত্ব পড়বে নতুন আসা গ্রাহকশ্রেণীকে বুনিয়াদি ব্যাঙ্কিংয়ে শিক্ষিত করে তোলার। কীভাবে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম চলে, টাকার সুদ কত রকমে দেওয়া হয় এগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা আশু কর্তব্য। এই সূত্রে বিদ্যালয়গুলিতে সাক্ষরতার সঙ্গে অর্থনীতির প্রাথমিক একান্ত জরুরি পাঠ দেওয়াও শুরু করা দরকার।

এযাবৎ চলা অসংগঠিত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের (মহাজন, ফড়ে, কাবুলিওয়ালা, বড় জোতদার মাধ্যম) লেনদেনকারী মানুষ অনেকেই সংগঠিত ক্ষেত্রে বদলি হয়ে যাবার নিশ্চিত সম্ভাবনা। কিন্তু ব্যাঙ্কের আমলাতান্ত্রিক কাঠামো নবীন গ্রাহকদের যদি উপযুক্ত পরিষেবা দিতে তৎপর না হয় সেক্ষেত্রে অসংগঠিত ব্যাঙ্কাররা আবার সুযোগ পেয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্ককর্মী দুর্নীতি পরায়ণতাকে প্রশ্রয় দিলে ও পরবর্তীকালে ধরা পড়লে বাজারে যে কেলেঙ্কারির আবহ সৃষ্টি হবে তার পরিণতিতে নিজস্ব মর্জিমাফিক উৎকট সুদে চলা অসংগঠিত সুদখোররা আবার এক নতুন শ্রেণীর ব্যাঙ্ক তৈরি করে ফেলবে। খবর ছড়াবে ব্যাঙ্কে গেলে কেলেঙ্কারিতে জড়াবে। আমরা অনেক ঝঞ্ঝাটহীন। একেবারে প্রথম দিকে প্রাচীন সেই আদান প্রদানের পদ্ধতিতে কিছুদিন লেনদেন চলতে পারে এমনই ৫০০ টাকার নোটের অভাবে সেটা পরিলক্ষিত হয়েছে। আগামী দিনে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক লেনদেনকে খুঁজে বের করার কারণে কোনো ক্ষেত্রেই আয়কে বরাবর লুকিয়ে রাখা যাবে না, লুকানো যাবে না বিক্রয়কর বা সম্পত্তি থেকে অর্জিত আয়কেও। করের আওতায় সবই অন্তর্ভুক্ত হবে।

বেশি সংখ্যক লোক কর ব্যবস্থা অনুসারী বা মান্য করে চললে করের আদায়ও বাড়বে, পরিণতিতে করের হারও কমে আসবে। এর ফলশ্রুতিতে রাজ্য সরকারগুলির বাজেট তৈরির ক্ষেত্রেও দীর্ঘমেয়াদি নৈতিক সুবিধে হবে। রাজ্যে নগদের জোগান বাড়বে। টাকা গোপন করে কোনো কিছুতে ঘুরিয়ে বিনিয়োগ করার আস্তানাগুলো না থাকলে সহজেই জমিবাড়ি সম্পত্তির দামের অধোগতি হবে। কয়েক বছরের মধ্যেই সম্পত্তি বেচাকেনার বিধিবদ্ধ নথিবদ্ধকরণ ও মালিকানা এভাবে নথিবদ্ধ হবে।

সম্ভাব্য করদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটার ফলে কর ব্যবস্থা সংক্রান্ত দপ্তরে বহু সংখ্যক কর্মী নিয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়বে যারা কর আদায় ও নিরীক্ষণের কাজে নিয়োজিত হবে। এই সূত্রে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে টাকা লেনদেন করার সংস্থাগুলি পাসওয়ার্ডের

ফঃ ৪

সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক প্রযুক্তি নিয়ে কাজ-কারবার করা সংস্থাগুলির বাড়বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকছে।

খেয়াল রাখতে হবে বিলাসবহুল জিনিসপত্র কেনা ও বিবাহ এবং অন্য এ ধরনের অনুষ্ঠানগুলিতে বেলাগাম খরচের ক্ষেত্রেই কালোটাকা বড় ভূমিকা নেয়। এর জোগানে টান পড়লে এই ধরনের জিনিসপত্র ও তৎজ্জনিত পরিষেবা ক্ষেত্রে (বিবাহ, জন্মদিন অনুষ্ঠানের প্রভৃত অনুষঙ্গ হিসেবে দেয় সার্ভিস সেক্টর) সংকোচন আসবে। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে খুচরো বিক্রির সঙ্গে জড়িত চাকরিক্ষেত্রে সাময়িক ঘাটতি দেখা দেবে। দামি বিদেশি উপঢৌকন দেওয়ার জন্য কালোটাকার জোগাড় বা টাকার আমদানি শুল্ক আদায় কমবে। বাণিজ্যিক ভূসম্পত্তি ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে টান পড়বে। এই ক্ষেত্রে সাময়িক কম বিনিয়োগ হওয়ায় বেকারি ঘটবে। অন্যদিকে বৈদ্যুতিন অর্থনৈতিক লেনদেনের মাধ্যমগুলি ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড, পেটিএম, মোবাইল ফোনগুলির ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ঘটলে এই ক্ষেত্রের খুচরো দোকান ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রম চাহিদা যথেষ্ট বাড়বে। বৈদ্যুতিন লেনদেন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেলে চোরাগোপ্তা টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনাও বাড়বে। সেক্ষেত্রে আইনি নিরাপত্তা ও পাল্টা বৈদ্যুতিন প্রতিরোধ ও কোড ওয়ার্ড সংরক্ষণেও পর্যাপ্ত সজাগ হওয়ার প্রয়োজন আছে। আইনের পথে জালিয়াতদের ধরে গ্রাহকের স্বার্থ দেখার বিষয়টি অগ্রাধিকারে অবশ্যই থাকবে।

চটজলদিও নয় আবার একেবারে দীর্ঘমেয়াদিও নয় মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই রাজনৈতিক দলকে দেওয়া অনুদানে ঘাটা পড়বে। কিন্তু দীঘকালীন পরিসরে ভারতকে কিন্তু নিজস্ব আইনসিদ্ধ পথে সাদা টাকাতেই প্রার্থী ও দলের নির্বাচনী খরচ চালাবার ব্যবস্থা করতে হবে। কালোটাকার সামগ্রিক দৌরাত্ম্য কমে আসার নির্বাচনী খরচ অনেকটাই কমে আসবে। উপযুক্ত নির্দল প্রার্থীরও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যায্য সুযোগ বাড়বে। আমলাতন্ত্রের ক্ষেত্রেও একই সঙ্গে সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিসরে দুর্নীতির প্রকোপ কমে আসলে তুলনামূলক ভাবে উচ্চমেধার প্রার্থীরা কী প্রশাসনিক ক্ষেত্র কী নির্বাচন লড়া উভয়েতেই যোগ দেওয়ার কথা ভাবতে পারে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে দুর্নীতি কমলে পরিচালকরা নিয়োগের ক্ষেত্রেও যোগ্যতামানে উন্নতি ঘটাতে পারে। ফলে যারা নিযুক্ত হবে তাদের হাতে উৎপাদিত পণ্য ও পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও উন্নতির সম্ভাবনা।

অন্যদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে কালোটাকার ক্যাপিটেশন ফি দিতে না পারায় সাময়িকভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং ও চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রী সংখ্যায় কিছু টান পড়বে। এই সংক্রান্ত বেশ কিছু কলেজ বেহিসেবি টাকার আমদানি থেমে যাওয়ায় বন্ধের মুখেও পড়বে। কিন্তু শিক্ষার গুণগতমানে উন্নতি অবশ্যই আশা করা যাবে। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অধিক বিশাল টাকা ঢুকে যাওয়ায় আর বি আই যদি না তা শুষে নেওয়ার কোনো বিধি লাগু করে তাহলে ঋণযোগ্য অর্থের পরিমাণ প্রচুর বাড়বে, ফলে সুদও কমে আসবে যা ইতিমধ্যেই পরিলক্ষিত হচ্ছে।

একথা অনস্বীকার্য ৫০০ ও ১০০০ নোট পর্যাপ্ত পরিমাণে বাজারে না ঢোকা পর্যন্ত চিরাচরিত দৈনন্দিন খুচরো লেনদেনের ক্ষেত্র কিছুটা মার খাবে। যার প্রভাবে আগামীদিনে ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির একটি কী দু'টি ত্রৈমাসিক ফলাফলের ওপর নেতিবাচক ধাক্কা আসবে। এর মধ্যে করতে না পারা লেনদেনের বেশ কিছু অংশই ভবিষ্যতে আবার বাস্তবায়িত হবে। দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রে সাদা টাকায় বর্ধিত লেনদেনের প্রভাবে অর্থনীতিতে শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। আগামীদিনের সামাজিক অর্থনৈতিক জরুরি পরিসংখ্যানগুলি অনেকটাই পরিচ্ছন্ন ও বেশি নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। এর ফলে যে-কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতেই এগোবার সুযোগ গড়ে উঠবে। উচ্চ অঙ্কের নগদ অর্থ বাতিল ও নতুন টাকা অর্থনীতিতে প্রবেশের ফলে দুর্নীতি নির্মূল করার পক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেওয়া হয়েছে তার নীতিনিষ্ঠতা দেখে অনেক রাজনৈতিক দলই এই স্বচ্ছতার ধারাবাহিকতার সঙ্গে নিজেদের জুড়ে নিতে পারে। প্রায়শই বলা হয়ে থাকে অর্থনীতিকে সচল রাখতে গেলে দুর্নীতি সদাই যন্ত্রাংশের পরিভাষায় Lubricant-এর কাজ করে। কথাটা সত্যিই কতদূর সত্যি সেটা আগামী কয়েকটা বছরেই বোঝা যাবে।

মনে রাখবেন, এই ভারতীয় পরীক্ষাগারের ওপর সারা বিশ্বের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। যদি এটি সফলভাবে রূপায়িত হয় সেক্ষেত্রে ভারতের কাছে কীভাবে তারা এই নোট বাতিল ও পুনর্নবীকরণ করল তার টোটকা নিতে আসবে। সেগুলি হয়তো তারা বাস্তবে প্রয়োগ নাও করতে পারে, কিন্তু যদি তারা ভারতকে অনুকরণ করে তাহলে ভারতের মতোই আকস্মিকতার ব্যাপারটাকে বিশাল মর্যাদা দিতে হবে, না হলে কী ফল হবে বলা শক্ত।

(লেখক ইয়েল স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টের অর্থনীতির অধ্যাপক)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার গ্রাহক ও এজেন্টদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন। ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

ক্যাশলেস
একটি নগদ ছাড়া লেনদেন ব্যবস্থা

ধর্মানন্দ দেব

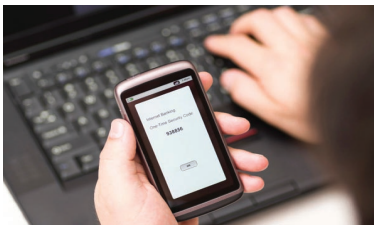

আমরা যদি বিশ্বের দিকে তাকাই দেখতে পাব Australia, Canada, France, Belgium, U.K. Sweden, Netherlands, USA ইত্যাদি বেশ কয়েকটি দেশে প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ ক্যাশলেস সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে এখনো ৭৮ শতাংশ মানুষ নগদে অর্থাৎ ক্যাশে লেনদেন করেন। আর কার্ড আমাদের দেশে ব্যবহার করেন মাত্র ৭ শতাংশ মানুষ। ডিজিটাল পেমেন্ট করেন ১৩ শতাংশ মানুষ। Other Paper ব্যবহার করেন ২ শতাংশ। তাই আমাদের দেশে ক্যাশলেস ১০০ শতাংশ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তবে সরকার পক্ষের বিশ্বাস ক্যাশলেসের উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা হলে সমাজ লেসক্যাশ হিসাবে গড়ে উঠবেই। তখনই আমাদের সমাজ ব্যবস্থা থেকে দুর্নীতি, কালোটাকা, উগ্রপন্থী সমস্যা কমবে এবং দেশের অর্থব্যবস্থা চাঙ্গা হবে। আর দেশের অর্থব্যবস্থা চাঙ্গা হলে দেশের উন্নয়ন হবে, বিকাশ হবে। কথা হচ্ছে যদি লেনদেন ক্যাশলেস বা লেসক্যাশ করতে হয় তবে কীভাবে এবং কেমন করে করতে হবে। নগদ লেনদেন ছাড়া আরো বিভিন্ন উপায়ে আমরা লেনদেন করতে পারি। প্রধান কয়েকটি ক্যাশলেস লেনদেন ব্যবস্থার নাম হচ্ছে— (১) কার্ড ব্যবহার করে, (২) USSD payment system মারফত, (৩) UPI App download করে, (৪) e-wallet ব্যবহার করে, (৫) আধার কার্ড মারফত, (৬) বি এইচ আই এম বা ভিম (ভারত ইন্টারফেস ফর মানি) অ্যাপ ডাউনলোড করে। ইত্যাদি।

এইসব ক্যাশলেস ব্যবস্থার মধ্যে আজ মাত্র দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নিয়েই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব— প্রথমত, কার্ড মারফত। যাদের ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট রয়েছে তাদের কাছে ওই ব্যাঙ্কের কার্ড আছে বা ব্যাঙ্কে আবেদন জানিয়ে কার্ড নিতে হবে। অর্থাৎ এটিএম কার্ড, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, রোপে কার্ড বা অন্য কোনো প্লাস্টিক কার্ড। সেই কার্ড আপনি স্যুইপ করে এবং আপনার গোপন পিনকোড এন্টার করে লেনদেন করতে পারেন। অবশ্যই সেই সময় রসিদ নিতে হবে। যেমন— আপনি শিলচরের বিগ বাজার, বিশাল, নাহাটা, দেবিকা ফ্যাশনস, শারদামণি স্টোর্স, পেট্রোলস পাম্প ইত্যাদি দোকানে লেনদেন করতে গেলে এক্ষুনি আপনি কার্ড ব্যবহার করে লেনদেন করতে পারেন। উল্লেখ্য, বাজারে অনেক সময় নগদে কেনাকাটা করলে প্রায়ই দেখা যায় দোকানদার আপনাকে রিসিপ্ট দিচ্ছে না বা দিলেও সেটা লোক দেখানো। আর ব্যবসায়ীরা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিক্রয়কর, আয়কর, ভ্যাট ইত্যাদি কর ফাঁকি দেয়। নগদবিহীন লেনদেন করা হলে ওই দোকানদারের ব্যাঙ্কের খাতায় টাকা থাকবে, সরকারের কাছে হিসাব থাকবে। কর ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয়ত, যে ক্যাশলেস ব্যবস্থার কথা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেই ব্যবস্থার জন্য কোনো ইন্টারনেট লাগবে না, লাগবে না কোনো দামি মোবাইল, প্রয়োজন পড়বে না ব্যাঙ্ক খোলা আছে না বন্ধ রয়েছে জানা এবং এই ব্যবস্থার মারফত আপনি সারা বছর সবসময় যে কোনো জায়গা থেকে লেনদেন করতে পারেন। সেই ব্যবস্থার নাম হচ্ছে— USSD payment system, USSD-র পুরো নাম হচ্ছে--- Unstructured Supplementary Service Data. নাম শুনেই মনে হচ্ছে যেন ব্যবস্থাটি কঠিন হবে। না এই ব্যবস্থা সবচাইতে সহজ। আপনার প্রিপেইড মোবাইল রিচার্জ কার্ড ভরানোর চেয়েও সহজ। এই ব্যবস্থার আরেক নাম হচ্ছে— *৯৯# সার্ভিস। এই সার্ভিস পেতে হলে প্রথমে থাকতে হবে ব্যাঙ্কে আপনার একটি অ্যাকাউন্ট এবং থাকতে হবে একটি মোবাইল। অবশ্য সেই মোবাইল একবারে কমদামি হলেও চলবে। অবশ্যই অ্যাকাউন্টে টাকা থাকা চাই। আর ওই অ্যাকাউন্ট-এর সঙ্গে আপনার মোবাইল নম্বরটি রেজিস্টার্ড করতে হবে। রেজিস্টার করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আপনাকে দুটি নম্বর দেবে। একটি হচ্ছে MMID নম্বর এবং অন্যটি হচ্ছে— MPIN-র নম্বর। এর পুরো নাম হচ্ছে—Mobile Money Identifier. এটি ৭ ডিজিটের নম্বর হবে। MPIN-র পুরো নাম হচ্ছে মোবাইল পিন। এটি ৪ ডিজিটের নম্বর হবে। এই MMID নম্বর এবং MPIN নম্বর আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং MPIN নম্বর গোপন রাখতে হবে। মনে করুন আপনি ব্যাঙ্ক থেকে MPIN নম্বর এবং MMID নম্বর পেয়ে গেছেন বা সংগ্রহ করেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কীভাবে লেনদেন করবেন। লেনদেন করতে হলে প্রথমে সেই *৯৯# আপনার রেজিস্টার্ড মোবাইল থেকে ডায়েল করতে হবে। ডায়েল করার কয়েক সেকেন্ডের ভিতরেই আপনার মোবাইল স্ক্রীনে একটা মেসেজ আসবে এবং এই মেসেইজে বলা হবে আপনার ব্যাঙ্কের শর্ট নেম-এর তিন অক্ষর বা আপনার ব্যাঙ্কের IFS Code-এর চার অক্ষর দেওয়ার জন্য। মনে করুন আপনার ব্যাঙ্ক হচ্ছে— স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তাহলে ওই ব্যাঙ্কের শর্ট নেমে-এর তিন অক্ষর হবে এসবিআই বা মনে করুন আপনার ব্যাঙ্ক হচ্ছে— সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তাহলে ওই ব্যাঙ্কের শর্ট নেম-এর তিন অক্ষর হবে সিবিআই। এই স্ক্রীন মেসেইজের নীচে আপনাকে এসবিআই বা সিবিআই লিখতে হবে অথবা যদি আপনার ব্যাঙ্কের IFS Code জানা থাকে তবে সেই IFS Code-র প্রথম চার অক্ষর বসাতে হবে। মনে রাখবেন আপনার ব্যাঙ্কের IFS Code আপনার অ্যাকাউন্টের পাসবুকে ও চেক

বুকে লেখা থাকবে। আর ওই কোড নম্বর বসানোর পর সেন্ড বা ওকে বা এন্টার মারতে হবে। তারপর স্ক্রিনে আরেকটি মেসেইজ আসবে যেখানে দেওয়া থাকবে ৮টি অপশান। সেগুলি হচ্ছে— ১ম অপশনে লেখা থাকবে— ব্যালান্স ইনক্যুয়ারি, দ্বিতীয় অপশনে লেখা থাকবে— মিনি স্টেটমেন্ট, তৃতীয় অপশনে লেখা থাবেবে— ফান্ড ট্রান্সফার-এমএমআইডি, চতুর্থ অপশনে লেখা থাকবে— ফান্ড ট্রান্সফার-অ্যাকাউন্ট নং, ৫ম অপশনে লেখা থাকবে— ফান্ড ট্রান্সফার-আধার, ষষ্ঠ অপশনে লেখা থাকবে— Know MMID, ৭ম অপশনে লেখা থাকবে--- চেঞ্জ এম-পিন, ৮ম অপশনে লেখা থাকবে--- জেনারেট-ওটিপি। স্ক্রিনে ভেসে উঠা ওই ৮টি অপশনের নীচে আপনাকে আপনার প্রয়োজনের নম্বর লিখতে হবে। মনে করুন আপনি আপনার ব্যাঙ্কের ব্যালেন্স জানতে চান তখন আপনাকে ১ লিখতে হবে। ওই ১ লিখে সেন্ড করার পর, আপনার মোবাইলে আসবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে থাকা ব্যালেন্স। আর যদি আপনি আপনার অ্যাকাউন্টের মিনি স্টেটমেন্ট জানতে চান তবে ২ লিখতে হবে। ওই ২ লিখে সেন্ড করার পর, আপনার মোবাইল আপনার অ্যাকাউন্টের মিনি স্টেটমেন্ট ভেসে উঠবে। তাই মোদীজী সত্যি বলেছেন— My Bank My Mobile My Wallet. এখন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যেটি হচ্ছে এই সার্ভিস মারফত লেনদেন। অর্থাৎ আপনি এখন কোনো জিনিস ক্রয় করেছেন তারজন্য সেই দোকানদারকে মোবাইল মারফত কীভাবে টাকা দেবেন। সেটি হচ্ছে ফান্ড ট্রান্সফার। আর সেটি তিন ভাবে করা যাবে। প্রথমত ফান্ড ট্রান্সফার-এম এম আইডি, দ্বিতীয়ত, ফান্ড ট্রান্সফার-অ্যাকাউন্ট নং, তৃতীয়ত, ফান্ড ট্রান্সফার-আধার। প্রথমে স্ক্রিনে ভেসে উঠা ৮টি অপশনের নীচে আপনি আপনার পছন্দমতো অপশন ৩ বা ৪ বা ৫ লিখবেন। তবে সবচাইতে সহজ হচ্ছে অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার। অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার করতে হলে আপনাকে ৪ লিখতে হবে। লেখার পরেই আসবে যাকে টাকা দেবেন সেই ব্যাক্তির অ্যাকাউন্ট নম্বর, সেই ব্যক্তির ব্যাঙ্কের IFS Code। এই দুটি নম্বর দেওয়ার পর আসবে কত টাকা দেবেন অর্থাৎ Amount and Remarks (optional) লেখা। এখন আপনি ৫০০ টাকা লিখলেন আর কিসের জন্য সেটা দেবেন সেটাও লিখতে পারেন বা না লিখলেও চলবে। যেমন ৫০০ লিখে একটা স্পেইস দিয়ে গ্রসারি লিখতে পারেন। সবশেষে দিতে হবে আপনার গোপনে রাখা MPIN নম্বর। সেই নম্বর যাতে অন্য কেউ জানতে না পারে। আর এমপিন নম্বর এনটার করার পরেই আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা চলে যাবে যাকে দিতে চান তার অ্যাকাউন্টে। আর আপনার মোবাইলে একটা সাকসেস এস এম এস আসবে। এইভাবে আমরা নগদ টাকার পরিবর্তে লেনদেন করতে পারি। নিজের মোবাইলকে একটি ব্যাঙ্ক বানাতে পারি। আর সেটা করতে যদি পারি তবে সমাজ থেকে দুর্নীতি ধীরে ধীরে নির্মল হবে। কালোটাকার ব্যবসায়ীরা হাত কামড়াবেন। সমগ্র দেশে যত নার্সিং হোম, যত বিদ্যালয়, যত কলকারখানা, ফ্যাক্টরি আছে সবাইকে সরকারকে কর দিতে হবে। আর যখনই সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি হবে এবং সঠিক কর সংগ্রহ হবে তখনই দেশের বিকাশ হবে। শুধু তাই নয় আপনার একটি ক্যাশ লেনদেনের জন্য সরকারের অনেক খরচ হয়। ব্যাঙ্ক কর্মচারী, নিরাপত্তা, ছাপার জন্য টাকা ব্যয়, বহন করার জন্য খরচ ইত্যাদি। আপনাকেও কষ্ট করতে হয়। ব্যাঙ্কে গিয়ে লাইন দিতে হয় এবং চুরি, ডাকাতি এবং ছিনতাইয়ের ভয় থাকে। নগদ টাকা নিয়ে চলাফেরা করাও কঠিন। বাড়িতে নগদ টাকা রাখা নিজের প্রাণের ভয় হয়ে দাঁড়ায়। তাই আসুন আমরা সবাই মিলে প্রতিজ্ঞা করি যে আমরা একটি নতুন সমাজ গড়ে তুলব যেটি হবে ক্যাশলেস সমাজ। অবশ্য এই ডিজিটাল লেনদেনেও ফাঁদ রয়েছে। তাই ডিজিটাল লেনদেন করার আগে জেনে নিন, কীভাবে আপনি আপনার লেনদেন সুরক্ষিত রাখবেন— (১) সব অ্যাকাউন্টের জন্য একই ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড রাখবেন না। (২) লেটার ও স্পেশাল ক্যারাক্টার মিলিয়ে পাসওয়ার্ড রাখা ভাল। অবশ্যই পাসওয়ার্ড হতে হবে স্ট্রং। (৩) কয়েকমাস পর পর এই পাসওয়ার্ডের পরিবর্তন করা ভাল। (৪) অনলাইন শপিং বিল পেমেন্ট ও অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার করার আগে আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপে অ্যান্টি- ভাইরাস আপডেট করা আছে কিনা দেখে নেওয়া ভাল। প্রয়োজনে স্ক্যান করুন। (৫) অনলাইন লেনদেনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ওয়েবসাইটটি 'https' দিয়ে শুরু হয়েছে কি না। 'S' মানে সুরক্ষিত। (৬) লেনদেন শেষ করে লগ আউট করতে ভুলবেন না। (৭) পাবলিক ওয়াই-ফাই ব্যবহার না করাই ভাল। (৮) কোনো সাইবার কাফেতে বসে গুরুত্বপূর্ণ লেনদেন না করাই ভাল। (৯) নিজের মোবাইল পিন বা পাসওয়ার্ড গোপন রাখবেন এবং ভুলবেন না। (১০) নতুন ওয়েবসাইটে গিয়ে কেনাকাটা করতে হলে ওয়েবসাইটটি এনক্রিপটেড কিনা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

উপসংহার, বর্তমানের ইন্টারনেটের যুগে সবাই যখন পাগলের মতো ছুটছে, কারো পিছনে তাকানোর সময় নেই, তবে আপনি কেন পিছিয়ে থাকবেন? আপনিও ডিজিটাল লেনদেন বা ক্যাশলেস লেনদেন বা লেসক্যাশ ব্যবস্থার সঙ্গে হাত মেলান। তবে দেশকে ক্যাশলেস বা লেসক্যাশ পরিণত করতে হলে কেন্দ্র সরকারের এক্ষুনি উচিত ডিজিটাল লেনদেনের সার্ভিস চার্জ মুকুব করা, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ ও মোবাইল সংযোগ প্রদান, সোয়াইপ মেশিন বৃদ্ধি করা, ডিজিটাল স্বাক্ষরতা অভিযান গ্রামে গ্রামে বিনামূল্যে প্রদান করা ইত্যাদি। আসুন এই ব্যবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে জেনে ব্যবহারে লেগে পড়ি। এটা খুবই দ্রুততম, সহজ, সময়-স্বল্প উপায়। যদি আমরা ক্যাশলেস বা লেসক্যাশ সমাজ গড়ে তুলতে পারি তবে দেশ থেকে দুর্নীতি অনেকাংশে দূর হবেই। স্ব স্ব কর্তব্যপালনে আন্তরিক সক্রিয়তা, সহ-নাগরিকের প্রতি সহমর্মিতা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কঠোর মানসিক শক্তি প্রয়োগই স্বপ্নপূরণের পাথেয় হতে পারে। নতুন বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুভ হোক এবং ধীরে ধীরে গড়ে উঠুক এক নগদহীন সমাজ।

(নিবন্ধকার পেশায় আইনজীবী)

নেত্রীর মাত্রাছাড়া আস্ফালনই তৃণমূলকে ডোবাবে

একলব্য রায়

লেখাটা যখন শুরু করলাম সে সময় বিক্ষোভ প্রদর্শনের নামে গোটা রাজ্যজুড়েই তৃণমূলী তাণ্ডব চলছে। নিশানায় ভারতীয় জনতা পার্টির অফিস, নেতাকর্মী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পৈতৃক ভিটে। রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা ঢাল তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের মতো। লেখাটা শেষ হয়ে আসছিল তখনই খবর খোদ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরেও পৌঁছে গেছে তৃণমূলী তাণ্ডব। নিরাপত্তা রক্ষীদের হতচকিত করে তৃণমূলের এমপিরা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে ঢুকে 'মোদী হটাও' স্লোগান দিতে থাকে। রাষ্ট্রপতি ভবন, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের মতো এলাকাগুলিকে সাধারণত জাতীয় মর্যাদার প্রতীক হিসেবে ধরা হয় এবং নোংরা রাজনীতির পরিসরে টেনে এনে এই জায়গাগুলিকে কেউ অসম্মানিত করার কথা ভাবেন না। সে রকম নজিরও নেই। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সেই নজিরবিহীন ঘটনাই ঘটিয়ে দিল।

টেলিভিশনের দৌলতে আমরা দেখেছি ৩ জানুয়ারি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারের খবর আসতেই রাজ্য বিজেপির সদর দপ্তর ঘিরে ধরে হামলা শুরু করে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরা। গুটি কয়েক কর্তব্যরত পুলিশকর্মী মারমুখী তৃণমূলীদের সামনে গিয়ে অনুনয় বিনয় করতে থাকে। আত্মরক্ষার তাগিদে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে তৃণমূল কর্মীদের ছোড়া পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত বিজেপি কর্মীদের মুখ টিভির দৌলতে সবাই দেখেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে না আনলে কী হোত বলা মুশকিল। এতেও আবার দোষ! তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা ছুটে গেলেন রাজ্যপালের কাছে। নালিশ জানালেন। বিজেপির রাজ্য সদর দপ্তর রক্ষা করে কেন্দ্রীয় বাহিনী যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আঘাত হেনেছে, রাজ্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে। কিন্তু একবারের জন্যও এই বর্বরোচিত হামলার নিন্দা করলেন না। এতে

বিজেপির রাজ্য অফিসে তৃণমূলের হামলা।

তো আমার এমনটাই মনে হচ্ছে যে তৃণমূল নেতারা জনরোষের নামে যা ঘটাতে চেয়েছিলেন তা ঘটাতে পারেননি বলেই নানা নিয়ম কানুন লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলছেন।

ঘটনার দুদিন পর থেকে তৃণমূল নেতারা বলতে শুরু করেছে বিজেপির লোকেরাই নাকি নিজেদের দপ্তর ঘিরে ধরে এই হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে। কুযুক্তির সাহায্যে জলজ্যান্ত সত্যকে মিথ্যা বানানোর এই ধরনের অপকৌশল তৃণমূল কংগ্রেস উত্তরাধিকার সূত্রে বামেদের থেকে পেলেও রাজ্য প্রশাসনের সদর দপ্তর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বিরোধীদলের সদর দপ্তরে এরকম প্রকাশ্য হামলার ঘটনা ৩৪ বছরের বাম শাসনের অন্ধকার যুগেও ঘটেনি। বাংলায় তো নয়ই বিহার ও তামিলনাড়ুতেও লালু যাদব, জয়ললিতা গ্রেপ্তার হওয়ার পরও দেশের বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা রাখতে দেখা গেছে। বিরোধী দলের কার্যালয়ে, খোদ রাজধানীর বুকে এরকম বিশৃঙ্খলা তৈরির নজির নেই।

তৃণমূল কংগ্রেস এবং নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর 'ডু অর ডাই' লড়াই দেখে এরকমই মনে হয় যে এই লড়াইয়ের উপরই যেন নির্ভর করছে তৃণমূল কংগ্রেসের অস্তিত্ব। আইন আদালত কিংবা সংবিধান সম্মত তদন্তের মাধ্যমে নয় বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রীরা নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে চান। মুক্ত করতে চান দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হওয়া দলীয় নেতাদের। এমন মারমুখী বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করতে চান যে আমজনতা তো দূরের কথা কেন্দ্রীয় সরকার, তদন্ত সংস্থা, বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্তরাও তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে আঙুল তুলতে সাহস পাবে না। অর্থাৎ সবাই বলবে আমরা কিছু দেখিনি, জানি না। ঠিক যেমন খুনের সাক্ষীদের খুনিরা শাসিয়ে থাকে। মন্ত্রী মদন মিত্র গ্রেপ্তার হওয়ার পর নেত্রী একই রকম আন্দোলন করে প্রভাবশালী তকমা লাগিয়ে বিপদ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। জেলে থাকতে হয়েছিল দু'বছর। দিল্লি থেকে কপিল সিব্বাল এসেও ছাড়াতে পারেনি।

প্রশ্ন হচ্ছে, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তারের পর প্রভাবশালী তকমা লেগে মদন মিত্রের মতো একই পরিণতি হতে পারে জেনেও দলনেত্রী সেই একই পথ নিলেন কেন? এই প্রশ্নের দুরকম উত্তর হতে পারে। এক, হতে পারে দলনেত্রী রোজভ্যালি কাণ্ডে গোটা দলেরই এমন ভাবে জড়িয়ে যাওয়ার বা সুদীপের চেয়েও আরো কোনো বড় রাঘব বোয়ালের জড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেছেন। শুধু আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে যেখান থেকে বেরিয়ে এসে রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন অস্তিত্বের সুতরাং মরণ কামড় দিতে হবেই।

তৃণমূলনেত্রী মাঝেমধ্যেই বলেন সিবিআই অফিসাররা নাকি ওঁকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত নানা খবর পাঠান। হতে পারে রোজভ্যালি কাণ্ডে সিবিআই সক্রিয় হচ্ছে জেনে আগাম সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন। নোট বাতিলের মতো হাতে গরম ইস্যু হাতে পেয়ে আগে থেকেই মাঠে নেমে পড়েছিলেন যাতে চিটফান্ড কাণ্ডে কেউ গ্রেপ্তার হলে এটা বলা যায় যে নোট কাণ্ডে সরব হওয়ার জন্যই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

দুই, প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি তাক করে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মোদী বিরোধী প্রধান মুখ হয়ে উঠতে চাইছেন বলেই ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বিরোধিতা। কলকাতা ভিত্তিক কিছু পেটোয়া সংবাদমাধ্যম ও লেখক- লেখিকা পরিকল্পনা-মাফিক মমতাকে মোদীর বিকল্প হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এমনটা তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে যে বামবিরোধী আন্দোলন যেমন তৃণমূল নেত্রীকে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে ঠিক তেমনি মোদী বিরোধিতার রোডম্যাপ ধরেই তিনি প্রধানমন্ত্রীর কুর্সির দিকে এগোচ্ছেন।

এই দু'রকম সম্ভাবনার কোনোটার পিছনেই কিন্তু মাত্রা ছাড়া নির্ভেজাল ক্ষমতার লোভ ও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়া মানুষের মঙ্গল বা রাজ্যের উন্নয়নের চিন্তা নেই। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে রাজ্যকে সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেন্দ্রের সহায়তা প্রয়োজন। ৩৪ বছরের বাম শাসনেও দেখা গেছে সিপিএম নেতারা উপর উপর যতই রাজনৈতিক বিরোধিতা করুক না কেন কেন্দ্রে যারা ক্ষমতা থাকতেন তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলতেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মমতা এই বিরোধিতাকে এমন তিক্ততার পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে এর কোনো পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। জ্যোতি বসুও কেন্দ্রের নির্বাচিত বাজপেয়ী সরকারকে অসভ্য বর্বরদের সরকার বলতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন।

মমতা ব্যানার্জি এক সময় হুমকি দিতেন নরেন্দ্র মোদীকে কোমরে দড়ি বেঁধে জেলে ঢোকাবেন, এখন বায়না ধরেছেন মোদীকে সরাতে হবে, আদবানী কিংবা জেটলিকে প্রধানমন্ত্রী করতে হবে, জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে। এই ধরনের কথা শুনে মনে হয় নরেন্দ্র মোদী যেন নির্বাচিত হয়ে আসেননি, মমতার দয়ায় বেঁচে রয়েছেন, চলাফেরা করছেন, প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তথ্য বলছে নোট বাতিলের পর ব্যবসার অসংগঠিত ক্ষেত্র ক্রমশই মূল স্রোতে শামিল হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ-সহ বিভিন্ন রাজ্যের রাজস্ব সংগ্রহ বেড়েছে। রাজ্যের বাসিন্দা হিসেবে আমাদের পর্যবেক্ষণে অস্বাভাবিক কোনো পরিস্থিতি নজরে না এলেও মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য পশ্চিমবঙ্গে নাকি নোট বাতিলের জেরে রাজস্ব সংগ্রহ কমেছে, দুর্ভিক্ষ-মহামারীর মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। চাষিরা চাষ করতে পারছে না, শ্রমিকরা কাজ না পেয়ে বেকার হয়ে বসে রয়েছে। ভিন রাজ্যে এই সমস্ত ছেলেমানুষী আচরণ নিয়ে হাসি মশকরা হলেও বাংলার কিছু সংবাদপত্র, লেখক সম্পাদক নিজেদের আখের গোছানোর জন্য তৃণমূলনেত্রীর এই ধরনের নিম্নমানের খাম-খেয়ালিপনাগুলিতে হাওয়া দিয়ে তোল্লাই দিয়ে নেত্রীকে আরো বিপথগামী করার জন্য যা যা করার সবই করছেন।

মমতা ভারতবর্ষে একমাত্র অ-বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী নন। রয়েছেন নীতীশ কুমার, চন্দ্রবাবু নাইডু, নবীন পট্টনায়েকের মতো মুখ্যমন্ত্রীরাও। এরা সবাই কেন্দ্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে নিজ নিজ রাজ্যের উন্নয়নের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রায় দশ কোটি মানুষের ভাগ্য বাজি রেখে রাজনৈতিক জুয়ায় মত্ত হয়ে আছেন।

সবচেয়ে আশ্চর্যের তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে তলানিতে ঠেকিয়ে দেওয়ার পর এ রাজ্যের সংবাদমাধ্যম বা কলমচিরা এই নিয়ে চুপচাপ। তৃণমূল কংগ্রেসের আমদানিকৃত এই ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক সংস্কৃতি বাংলাকে যে অরাজকতার গভীর অন্ধকারে নিক্ষেপ করছে এব্যাপারে একবারের জন্যও কেউ উচ্চবাচ্য করছেন না। তবে গত ১৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত কোচবিহার ও তমলুক লোকসভা এবং মন্তেশ্বর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট হবে, মমতা সম্পর্কে রাজ্যবাসীর সচেতন অংশের মোহ ক্রমশই ভঙ্গ হচ্ছে এবং সুযোগ পেলেই জবাব দিচ্ছে। যেমন, কোচবিহার লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেস জিতলেও কোচবিহার পৌর সভার ২০টি ওয়ার্ডে, মাথাভাঙ্গা পুরসভার ১২টির মধ্যে ৯টিতে, দিনহাটা পুরসভার ১৬টির মধ্যে ৭টিতে বিজেপি প্রার্থীরা বেশ ভালো ভোটে এগিয়ে ছিল। গ্রামাঞ্চলে অবাধ নির্বাচন হলে যে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের পথ সুগম হোত না এটাও এখন মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।

এ রাজ্যে চিটফান্ড কেলেঙ্কারি হয়েছে, রোজভ্যালি সারদার মতো চিটফান্ড হাজার হাজার আমজনতাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। সব হারানোর অভিঘাতে মৃত্যুর মিছিলও দেখেছে রাজ্যবাসী। সরকারি মদত ছাড়া চিটফান্ডের এতটা বাড়বাড়ন্ত যে সম্ভব নয় এটা আমজনতাও বোঝে। তদন্তে কী প্রমাণ হবে সে পরের কথা কিন্তু চিটফান্ড কর্তাদের ব্যবসা বৃদ্ধিতে মমতা ব্যানর্জী সরকারের উচ্চপদস্থ নেতা মন্ত্রীরা কীভাবে সর্বসমক্ষে প্রভাব খাটিয়েছে তা মানুষ দেখেছে। মমতা সরকারের জমানায়ই চিটফান্ড পাপের ষোলকলা পূর্ণ হয়ে বিস্ফোরণ হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই তৃণমূলের অভিযুক্ত নেতা মন্ত্রীদের আইন আদালতের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলে অভিযুক্ত নেতা মন্ত্রীদের নির্দোষ প্রমাণ করার সর্বাত্মক প্রয়াস দেশের নিম্নগামী রাজনীতির মানকে আরো নিম্নগামী করবে, আইন আদালত বিচার ব্যবস্থার প্রতি এক অনাস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করবে। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে আমার এটা মনে হয়েছে সারদা, নারদা, রোজভ্যালি কাণ্ডে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তার নিয়ে মমতা যতই সুর চড়াচ্ছেন, সর্বভারতীয় স্তরে এমনকী তদন্ত সংস্থাগুলির অন্দরেও নেত্রীর অভিপ্রায় নিয়ে ততই সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে। এই সন্দেহই অশেষ দুঃখ টেনে আনতে পারে তৃণমূল নেত্রীর কপালে। যা কিনা হতভাগ্য পশ্চিমবঙ্গবাসীরও দুর্ভোগের কারণ হতে পারে। ■

এম.টেক যুবক এখন কৃষক

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আজকাল উচ্চশিক্ষিত যুবক-যুবতীরা চাকুরি করার জন্য বিদেশে যেতে খুবই পছন্দ করেন। যাওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যে নিজের দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেন। শুধু তাই নয়, বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে ভুলে যান। কিন্তু এদের মধ্যে কেউ কেউ বিদেশের সমৃদ্ধির আস্বাদ পাওয়ার পরও একদিন মাটির টানে দেশে ফিরে আসেন। নিজের গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে চান।

এরকমই এক যুবক রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগর নিবাসী রণদীপ সিংহ কংগ। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। মুম্বয়ের শ্যামলাল কলেজ থেকে ইলেক্ট্রনিকসে বি-টেক করার পর ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান জস স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করেন। দেশে থাকার সময়

রণদীপ নিজ হাতে গো-মূত্র সার তৈরি করছেন।

জাতীয়স্তরের হকি খেলোয়াড় ছিলেন। কিন্তু তাঁর বাবার ইচ্ছা ছিল না ছেলে হকিতে ক্যারিয়ার তৈরি করুক। বাবার ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে রণদীপ একজন সফল ইঞ্জিনিয়ার হন।

ইলেক্ট্রনিকসে মাস্টারস্ হওয়ার পর রণদীপ পাঁচ বছর সেখানে চাকরি করেন। ২০০৭ সালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ওয়াশিংটনে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খোলেন। ব্যবসা বেড়ে যাওয়ায় আরও দু'টি স্টোর খোলেন। তাঁর নিজের কথায়— 'সে সময় আমি প্রচুর টাকা উপার্জন করি। টাকার নেশায় মেতে থাকতাম। আমি কৃষকের সন্তান হলেও কৃষিকাজে রুচি ছিল না।'

আমেরিকায় রণদীপের এক বন্ধু ছিলেন। তার কমলালেবুর চাষ ছিল। কিন্তু কমলালেবুর ফসল ঠিকমতো না হওয়ায় সে খুব চিন্তিত ছিল। বাবার কাছে রণদীপের গোমূত্রের উপযোগিতার কথা শোনা ছিল। তাই বন্ধুকে জৈবিক কৃষির বিষয়ে বলেন। গোমূত্রের সঙ্গে নিমপাতা, তামাকপাতা, রসুন মিশিয়ে ফুটিয়ে সেই তরল সার কমলালেবুর জমিতে ও গাছে প্রয়োগ করেন। অভূতপূর্ব ফল পাওয়া যায়। কমলালেবুর ফলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা কীটনাশকেরও কাজ করে। আর দেরি করেননি রণদীপ। ২০১২ সালে আমেরিকার ব্যবসা বিক্রি করে দিয়ে নিজ গ্রাম শ্রীগঙ্গানগরে ফিরে আসেন। এলাকার কৃষকরা কৃষিকাজের জন্য বৃষ্টির জলের জন্য অপেক্ষা করে থাকতেন। তার ওপর রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে এলাকার মানুষ হাড়ের রোগ, ডায়াবেটিস ও ক্যানসারে আক্রান্ত। এসব দেখে রণদীপের মন ব্যাকুল হয়ে পড়ে। তিনি গ্রামের লোকদের জৈবিক কৃষির কথা বলেন। প্রথমে মানুষ বিশ্বাস করতে চায়নি। তাই তিনি বাবার একশো বিঘা জমিতে চাষ শুরু করেন। সেই গোমূত্র দিয়ে তৈরি সার ও কীটনাশক। তাদের জমিতে ফসলের বাড়বাড়ন্ত দেখে এলাকার লোক তাজ্জব। শ্রীগঙ্গানগর এলাকার সমস্ত কৃষক আজ রণদীপের কাছ থেকে গোমূত্রের সার ও কীটনাশক তাদের জমিতে প্রয়োগ করে দু'টো পয়সার মুখ দেখছেন। রণদীপ বলেন, 'জমি থেকে ভালো ফসল পাওয়ার জন্য মাটির ১৪টি উপাদানের প্রয়োজন হয়। গোমূত্রে ১৬টি উপাদান থাকে। গোমূত্র প্রয়োগের ফলে প্রথম ফসলের জন্য জমিতে ৫ বার সেচ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বার ৪ বার, তৃতীয়বার ৩ বারেই ফসল পাওয়া যায়।

গ্রাম গ্রাম থেকে রণদীপ ৫ টাকা লিটার দরে গোমূত্র কিনে এনে সার ও কীটনাশক তৈরি করে তা ৪০ টাকা লিটার দরে কৃষকদের কাছে বিক্রি করছেন। বেশি গোমূত্রের জন্য তিনি গোশালা করার কথাও ভেবেছেন। কৃষকদের মধ্যে জৈবিক চাষের জন্য রণদীপ গত ৬ মাসে ১০০ স্থানে কৃষকদের নিয়ে সভা করেছেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ২০০ জন কৃষক একসঙ্গে চাষ করছেন। বর্তমানে রাজস্থানের সব জেলায় রণদীপের গোমূত্র ব্যবহার হচ্ছে। পঞ্জাব, হরিয়াণা ও মধ্যপ্রদেশের কৃষকরাও তার সঙ্গে পরামর্শের জন্য আসছেন।

কৃষকদের উৎসাহের জন্য রণদীপ প্রথম দিকে বিনা পয়সায় গোমূত্রের সার বিতরণ করতেন। কৃষকদের আয় বাড়লে পয়সা নিতেন। ফার্টিলাইজার কোম্পানি তার কাছ থেকে ৫০ টাকা লিটার দরে জৈবিক সার কেনার জন্য এসেছিল। রণদীপের বক্তব্য, 'আমি আমেরিকায় অনেক পয়সা উপার্জন করেছি। আমার আর পয়সার লোভ নেই। আমি চাই এদেশের কৃষকরা শুদ্ধ খাদ্যশস্যে দেশ ভরিয়ে তুলুক। দেশের মানুষ নীরোগ হোক।' তিনি আরও জানালেন, তার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক করার জন্য Facebook, Goolle Plus এবং Twitter- এ দেশের যে-কোনো প্রান্তের মানুষ যোগাযোগ করতে পারেন। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

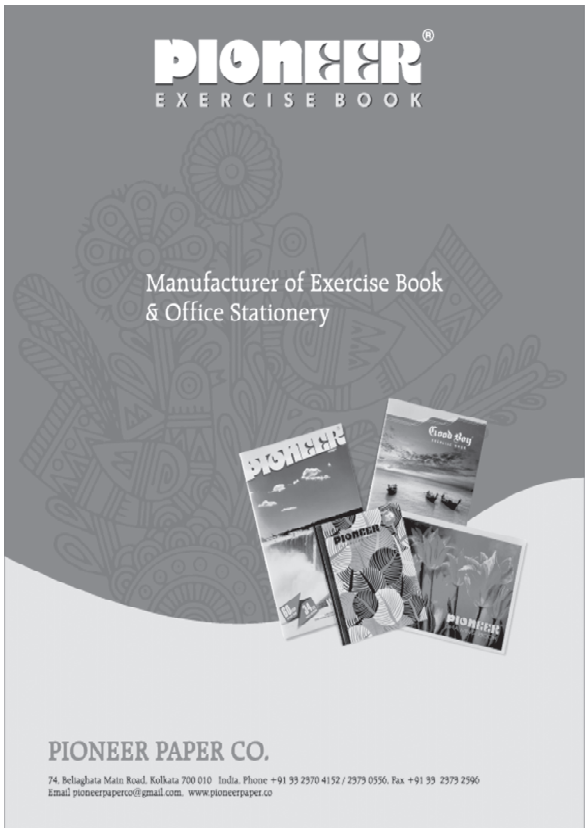

''প্রাচীন ভারতের 'জ্ঞান' বৃথা বাক্যমাত্র নয়, এ বিষয়ে জগতের সামনে তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এটা অবশ্যই সত্য যে ভারত ছাড়া অপর কোনো দেশে তিনি আবির্ভূত হতে পারতেন না। কিন্তু এও সত্য নয় যে তিনি কেবলমাত্র বা প্রধানত ভারতীয় মনীষাই প্রকাশ করেছেন। কারণ তাঁর মধ্যে সকল মানুষের অনুভূতি ও চিন্তা মিলিত হয়েছে আর তিনি— এই কালীভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ, মানবতার প্রতিনিধি।''

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

প্রস্টেট ক্যানসার ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

প্রস্টেট ক্যানসার আজকের রোগ নয়। বহুদিন আগে এই রোগের সন্ধান মিলেছে। তবে কালের বিচারে প্রস্টেট ক্যানসারের সংখ্যা বর্তমানে হু হু করে বাড়ছে। আমেরিকার ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট থেকে পাওয়া হিসেব অনুসারে পুরুষদের ক্ষেত্রে নন-স্কিন ক্যানসারের শীর্ষে আছে প্রস্টেট ক্যানসার। দেখা যাচ্ছে, ফুসফুসের ক্যানসারের পরে এই ক্যানসারেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পুরুষ মারা যাচ্ছেন। কিছুদিন আগেও একে পশ্চিমের রোগ বলে মনে করা হত, তবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্যাথোলজি

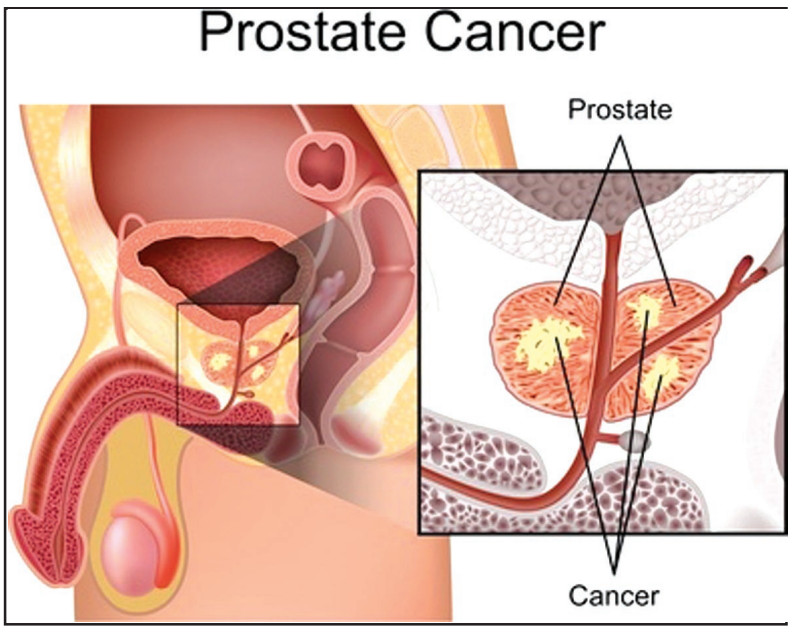

প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে ভারতেও প্রস্টেট ক্যানসার আক্রান্তেরা সংখ্যায় এখন দ্বিতীয়। অন্যদিকে বেঙ্গালুরু ও মুম্বইয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে সময়ের সঙ্গে গ্রামীণ মানুষেরা শহরমুখী হচ্ছেন, সচেতনতা বাড়ছে এবং চিকিৎসা পরিষেবা সহজসাধ্য হয়ে পড়ায় অনেক বেশি মানুষের মধ্যে এই রোগের বিস্তার ধরা পড়ছে। তাছাড়া ভারতের নাগরিকদের মধ্যে জীবনশৈলী, খাদ্যাভ্যাস এবং আর্থ-সামাজিক পরিবেশে বিস্তর পরিবর্তন এসেছে। অনুমান করা হচ্ছে যে ২০২০ সাল নাগাদ প্রস্টেট ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যা আজকের তুলনায় দ্বিগুণ হবে।

পিএসএ একটি মস্ত হাতিয়ার : প্রস্টেট ক্যানসার নির্ধারণে মস্ত হাতিয়ার পিএসএ বা প্রস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন টেস্ট। এটি একটি সামান্য রক্তের পরীক্ষা। পিএসএ এমন একটি উপাদান যা শুধু প্রস্টেট গ্ল্যান্ডেই তৈরি হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তের পিএসএ মাত্রা ১ থেকে ৪-এর মধ্যে থাকে। তবে পিএসএ পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফল স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হওয়া মানেই যে মানুষটির প্রস্টেট ক্যানসার হয়েছে এমন ভাবনা বিভ্রান্তিকর।

পিএসএ বেশি মানেই ক্যানসার নয় : বংশগত ধারা বজায় রাখতে পুরুষ শরীরে যে সিমেন তৈরি হয়, তার একটি বিশেষ উপাদান প্রস্টেট গ্ল্যান্ড তরল আকারে সরবরাহ করে। আর এই উপাদানের অন্যতম অংশ হল পিএসএ। পিএসএ আদতে একটি প্রোটিন-জাতীয় উপাদান। মনে রাখতে হবে, সিমেনে মেশার পাশাপাশি কিছু পিএএম একই সঙ্গে রক্তে গিয়েও মেশে। আর এরা পরিমাপযোগ্য। যেহেতু পুরুষমাত্রেরই প্রস্টেট গ্ল্যান্ড থাকে, তাই তাঁদের রক্তে পিএসএ পাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এটা জেনে রাখা ভালো, প্রস্টেট গ্ল্যান্ড যত বড় হবে তা থেকে পিএসএ বেরনোর পরিমাণও বেশি হবে। স্বাভাবিকভাবেই তাই কমবয়সিদের তুলনায় বয়স্কদের রক্তে বেশি পিএসএ মিলবে। কারণ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্টেট গ্ল্যান্ডও বড় হতে থাকে। সুতরাং, কারও পিএসএ বেশি হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তাঁর ক্যানসার হয়েছে।

গ্লিসান স্কোর গ্রেড : প্রস্টেট ক্যানসারের শ্রেণী-চরিত্র বোঝার জন্য ফলাফল ভিত্তিক গ্রেডের ব্যবস্থা রয়েছে। শ্রেণী নির্ধারণের এই পদ্ধতিটি ১৯৬৬ সালে আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কর্তা ডাঃ ডোনাল্ড গ্লিসানের নামানুসারে একে 'গ্লিসান স্কোর' বলা হয়। কোনও ক্যানসারের গ্রেড নির্ধারণের জন্য আক্রান্ত অংশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে নমুনা নিয়ে পরীক্ষার পরে নমুনা দুটিকে ১ থেকে ৫-এর ভিত্তিতে নাম্বার দেওয়া হয়। প্রাপ্ত দুটি নম্বরকে যোগ করে দেখা হয় মোট নম্বর কত হল। ধরা যাক, এই নমুনার ক্যানসার পরীক্ষা করে ২ নম্বর এবং অন্য আর এক নমুনার ক্যানসার পরীক্ষা করে ৩ নম্বর দেওয়া হল। তাহলে মোট প্রাপ্ত নম্বর হবে ২+৩ = ৫। অর্থাৎ

পূর্ণমান ১০(৫+৫)-এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর হল ৫। এই ক্ষেত্রে ক্যানসারের গ্রেডকে ৫/১০ হিসাবে লেখা হবে। বলা বাহুল্য সবচেয়ে খারাপ নম্বর ১০/১০। প্রাপ্ত নম্বর যত কম হবে রোগটির ঝুঁকি তত কম। গ্লিসান স্কোর ১০ হওয়া মানে অত্যন্ত খারাপ।

ক্যানসারের স্টেজ নির্ধারণ : বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে ক্যানসারকে চারটি স্টেজে ভাগ করা হয়। এরা হল প্রথম স্টেজ, দ্বিতীয় স্টেজ, তৃতীয় স্টেজ ও চতুর্থ স্টেজের ক্যানসার। প্রথম ও দ্বিতীয় স্টেজের ক্যানসার প্রস্টেটের ভেতরে সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ, এরা বাইরে ছড়িয়ে পড়েনি। ক্যানসারটি প্রথম পর্যায়ের হবে, না দ্বিতীয় পর্যায়ের তা আয়তনের ওপরে নির্ভর করে। অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের টিউমারকে প্রথম পর্যায়ে এবং তুলনামূলকভাবে কিছুটা বড় টিউমারকে দ্বিতীয় পর্যায়ের টিউমার বলা হয়। তৃতীয় পর্যায়ের ক্যানসার বাড়তে বাড়তে প্রস্টেটের বহিরাবরণ ক্যাপসুলকে স্পর্শ করে ফেলে। এই ক্রমবর্ধমান টিউমার যখন বাড়তে বাড়তে ক্যাপসুল ফুঁড়ে বেরিয়ে অন্য অঙ্গ বা হাড়কে স্পর্শ করে ফেলে তখন সেটিকে চতুর্থ পর্যায়ের ক্যানসার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

আবার অন্য এক ভাবেই ক্যানসারের স্টেজ ঘোষণা করা যেতে পারে। সেটি হল ক্যানসারটি কোন স্টেজের, আর্লি নাকি লেট। আর্লি ক্যানসার তাকেই বলা হবে যেখানে রোগটি প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। গ্ল্যান্ড ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যায়নি। প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের ক্যাপসুলের ঠিক বাইরে পর্যন্ত ক্যানসারের বিস্তৃতি প্রারম্ভিক বা আর্লি পর্যায়ের ক্যানসার নির্দেশ করে। ক্যাপসুল ছড়িয়ে যদি সেটি পাশের কোনও অঙ্গ, যেমন লিভার কিংবা হাড়ে পৌঁছয় তখন সেটা লেট পর্যায়ের বলে ধরে নিতে হবে।

আর্লি গ্রেড ক্যানসার : পরিতোষ পাল নামে এক ব্যক্তি বেড়ে যাওয়া পিএসএ নিয়ে এসেছিলেন। তবে ইউরিন কালচারে কোনও সংক্রমণের সন্ধান না পাওয়ায় তাঁকে এম আর আই করতে বলা হয়। সেখানে ইতিবাচক সংকেত মিলতেই বায়োপসি করা হয়। বায়োপসিতে কিন্তু ক্যানসারের খোঁজ মিলল। পরিতোষবাবুর গ্লিসান স্কোর ছিল ৫-এরও কম। অর্থাৎ তাঁর লো গ্রেড ক্যানসার হয়েছিল। এবারে পারিবারিক ইতিহাস ও খাদ্যাভ্যাসের বিষয়ে বিস্তারিত জেনে অন্য কোনও ঝুঁকির সন্ধান না পেয়ে পালবাবুকে দীর্ঘকালীন পর্যবেক্ষণে রাখা হল। বছর বছর এম আর আই করে পাঁচ বছর বাদে দেখা গেল তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন।

অ্যাডভান্সড স্টেজের প্রস্টেট ক্যানসার : তুষারবাবুর মতো সবার যে লো গ্রেড ক্যানসার হয় এমন নয়। স্বর্ণেন্দুশেখর সামন্তের কথা বলা যাক। বর্ধিত পিএসএ'র পাশাপাশি তাঁর গ্লিসান স্কোর ছিল ৭। এম আর আই করে স্ক্যান করে জানা যায় রোগের বিস্তার হয়নি। তবে স্বর্ণেন্দুবাবুর পরিবারের প্রস্টেট ক্যানসারের ইতিহাস ছিল। সুতরাং, তাঁর ক্ষেত্রে ঝুঁকি ছিলই। স্বর্ণেন্দুবাবুকে বলা হয়েছিল, অস্ত্রোপচার করে তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলা সম্ভব। তিনি অপারেশন করতে ভয় পেয়েছেন, রেডিওথেরাপি'ও করা যেতে পারে। তবে তাতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক বেশি। তাই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তিনি এসেছিলেন।

লেট স্টেজের ক্যানসার : অনেক রোগীই আসেন, যাঁদের পিএসএ হয়তো ৫০-এরও বেশি এবং গ্লিসান স্কোর ১০। অর্থাৎ আগ্রাসী চরিত্রের ক্যানসারের শিকার তাঁরা। হাড়ের স্ক্যান করে পজিটিভ ফল পাওয়া গেলে হরমোন চিকিৎসা শুরু করা হয়। তাতে ২-৩ বছর দিব্যি ভালো থাকেন তাঁরা। তার পরে কেমোথেরাপি শুরু করে আরও ২ বছর পর্যন্ত তাঁদের বাঁচিয়ে রাখা যায়। এর অর্থ ক্যানসার নির্ধারণের পরে প্রায় ৫-৬ বছর এঁরা ভালোভাবেই বেঁচে থাকেন। পিএসএ কিছুটা বেশি থাকলেও জীবনের গুণগত মানে কোনও হেরফের হয় না।

শেষে : শুধুমাত্র পিএসএ পরীক্ষা ও পরে বায়োপসির ওপরে নির্ভর করে দেখা গিয়েছে, অস্ট্রেলিয়া/নিউজিল্যান্ড, পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় গোটা বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক প্রস্টেট ক্যানসার হয়।

এছাড়া ক্যারাবিয়ান, দক্ষিণ আমেরিকা ও সাব-সাহারান আফ্রিকায় প্রস্টেট ক্যানসার আক্রান্তদের সংখ্যা অসম্ভব দ্রুত হারে বাড়ছে। এ দেশের বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যার তুলনায় অতিরিক্ত অশিক্ষা ও সচেতনতার অভাব এই রোগকে ক্রমেই বাড়াচ্ছে। তাই বলব, পঞ্চাশোর্ধ বয়সে নির্মোহ ও উদাসীন না থেকে বছরে একবার পিএসএ টেস্ট করান, যা 'প্রস্টেট ক্যানসারের স্ক্রিনিং'-এর একটি অঙ্গ। এতে আপনি অনেক বেশি নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন। এক সময়ের 'অজেয়' এই রোগ আজ হাতের মুঠোয়।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা : প্রস্টেটের ক্যানসার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় যে সমস্ত ওষুধগুলি ব্যবহার করে সুফল পেয়েছি সেগুলি হল ক্যারসিনোসিন, চিমাফিলা, প্রেট্রোসোলিনাম, ক্যানারিস, ক্যানবিস স্যাটাইভা, জুমনিসপার, বারবারিস, সেবাল-সার, ব্রাইওফাইলাম, সিফিলিনাম প্রভৃতি। তবে কখনই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। ▮

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

চিঠিপত্র

পশ্চিমবঙ্গে পাকিস্তান বিরোধী কথা বলা যাবে না

আমরা অনেকেই হয়তো একজন বিখ্যাত লেখক ও বক্তা তারেক ফতের নাম শুনে থাকব। যিনি পাকিস্তানে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানকে অন্ধভাবে সমর্থন না করে পাকিস্তানের অন্যায়গুলোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। একটি জনপ্রিয় হিন্দি খবরের চ্যানেলে তাঁর একটি শো-এর প্রচারে এসে তিনি মন্তব্য করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন তথা সরকার তাঁকে রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছে না। কারণ তিনি পাকিস্তান বিরোধী কথা বলেন।

এবার কথা হচ্ছে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন একজন পাকিস্তানি গায়ক (যিনি পাকিস্তানের বর্বরোচিত কার্যগুলোর তিলমাত্র নিন্দা না করে প্রশংসা করেন)-কে পশ্চিমবঙ্গে গান গাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করেন এমন একটা সময়ে যখন পাকিস্তান আশ্রিত জঙ্গিরা ভারতের বিভিন্ন সেনাব্যারাকে হামলা করে আমাদের দেশের সন্তানদের বর্বরভাবে হত্যা করছে। এমন সময় যখন ভারতবর্ষের প্রতিটা রাজ্যসরকার তার গানের শো বন্ধ করে দিচ্ছে নিজ নিজ রাজ্যে। কিন্তু যিনি আমাদের শত্রুদেশ পাকিস্তানের নিন্দা করেন এবং পাকিস্তানের সব ঘৃণ্য কর্ম আপামর জণগণের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, তাকে কেন আমাদের রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না? এতদিন জানতাম দিদিভাই মুসলমানদের ভালবাসেন, কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে উনি ভারত বিরোধী দেশ পাকিস্তানের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। যদিও ব্যাপারটা আগে আন্দাজ করা যাচ্ছিল, কারণ দিদি যেকোনো বিষয়েই আগ বাড়িয়ে কথা বলতে ভালবাসেন। সেই দিদি যখন দিল্লি জে.এন.ইউ-তে কানাইহা কুমাররা দেশবিরোধী স্লোগান ও 'পাকিস্তান জিন্দাবাদের' ঝড় তুলেছিল তখন তার বিরুদ্ধে একটি কথাও খরচ করেননি বা দিল্লির যন্তরমন্তরে ধরনায় বসেননি।

দিদি কি ভুলে গেছেন যে এই পাকিস্তানের তাড়া খেয়েই পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। তিনিই আবার পাকিস্তানের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন এবং যা তোষণ শুরু করেছেন, তিনি থাকলে আমাদের রাজ্যও ২০৫০-এর মধ্যে পাকিস্তান হয়ে যাবে, তখন পাকিস্তানের তাড়া খেয়ে আবার কোথায় মাথা গুঁজবে। তখন তো আর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী থাকবেন না যে আপনার মতো হিন্দুর কথা ভেবে আবার এরকম একটি পশ্চিমবঙ্গ তৈরি করার জন্য জীবন দেবেন? দিদি বোধহয় যোগেন মণ্ডলের কথাটা ভুলে গেছেন।

—**অর্ণব বন্ধু,**
কানপুর, বর্ধমান

ইজরায়েলের পথে ভারত

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ''আক্রান্ত হলেই ইজরায়েলের মতো প্রত্যাঘাত করব।'' মোদী সঠিক উদাহরণই দিয়েছেন। কারণ গেরিলা আক্রমণ প্রতিহত করতে ইজরায়েলের 'সার্জিকাল স্ট্রাইক' -এর জুড়ি মেলা ভার। সশস্ত্র ফিলিস্তিনি গেরিলারা চিরশত্রু ইজরায়েলকে মানচিত্র থেকে মুছে দিতে মাঝে মধ্যেই চালাত সীমান্ত আগ্রাসন। আর তখনই ইজরায়েলি সেনা 'সার্জিকাল স্ট্রাইক'-এর মাধ্যমে বিধ্বংস করে দিত ফিলিস্তিনি গেরিলা আক্রমণ। অর্থাৎ Tit for Tat.

অবশ্য ফিলিস্তিনি গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে পাক জঙ্গিবাহিনীর মিল আছে বহুলাংশে। ফিলিস্তিনি গেরিলারা জেহাদি ও ফিদায়েঁ (আত্মঘাতী) আদর্শে দীক্ষিত। পাক ইসলামিক জঙ্গিরাও একই নীতি-আদর্শে দীক্ষিত। পাক জঙ্গিদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেমন ভারতের অভ্যন্তরে সন্ত্রাস, অন্তর্ঘাত চালিয়ে ও জালনোট ছড়িয়ে অর্থনীতিকে ধ্বংস করা তেমনি ফিলিস্তিনি গেরিলাদেরও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইজরায়েলের অর্থনীতিকে ধ্বংস করা। পাকসেনার সহায়তায় ইসলামিক জঙ্গিরা চায় কাশ্মীর উপত্যকার দখল নিতে। আর ফিলিস্তিনি গেরিলারা চায় প্যালেস্টাইন লিবারেশন আর্মির ছত্রছায়ায় গোলান হাইট, গাজা ভূখণ্ড ও জেরুজালেমের দখল পেতে। অধিকন্তু পাকিস্তান তার জন্মলগ্ন থেকেই ভারতবিরোধী এবং ভারতকে বিনাশ করতে মরিয়া। ফিলিস্তিনও ইজরায়েলের জন্মলগ্ন থেকে তার বিরোধী এবং অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। পাকিস্তান প্রচণ্ড হিন্দু বিদ্বেষী (দ্বিজাতি তত্ত্ব অনুসারে)। ফিলিস্তিনও প্রচণ্ড ইহুদি বিদ্বেষী। উল্লেখ্য, মুসলমান আক্রমণে ইহুদিরা জন্মভূমি থেকে উৎখাত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাটায় প্রায় দেড় হাজার বছর যাযাবর জীবন। ওই সময় দু'জন ইহুদির দেখা হলে বলত, আসছে বছর দেখা হবে জেরুজালেমে। অতঃপর রাষ্ট্রসঙ্ঘের ব্যবস্থাপনায় ১৯৪৮ সালে ইহুদিরা ফিরে পায় তাদের জন্মভূমি ইজরায়েল, যা ছিল ফিলিস্তিনিদের দখলে। আর এভাবে ফিলিস্তিনিদের দখলীকৃত ভূখণ্ডে ইজরায়েল রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে ফিলিস্তিনিরা মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি। একদা ওই ভূখণ্ড (নীলনদ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত) যে ছিল ইহুদিদের বাসভূমি তা স্বীকার করে না তারা। তারা দখলদারিতেই বিশ্বাসী।

প্যালেস্টাইন লিবারেশন অরগানাইজেশন (PLO)-র চেয়ারম্যান ইয়াসের আরাফতের রাজত্বকালে ইজরায়েল হয়েছে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত। লিবারেশন আর্মি (PLA) তথা ফিলিস্তিনি গেরিলারা কখনও চালাত চোরাগোপ্তা আক্রমণ, কখনও ছুঁড়ত ক্ষেপণাস্ত্র, গোলাগুলি ও রকেট। ইজরায়েল দিত চোয়ালভাঙা জবাব। যদিও ইজরায়েলকে ঘিরে রয়েছে প্রায় ৩০টি মুসলমান দেশ। তবুও ইজরায়েলই হোত যুদ্ধ জয়ী। ৩০টি রাষ্ট্র এক সঙ্গে ইজরায়েলকে আক্রমণ করলে ইজরায়েল হোত বিধ্বংস। কিন্তু

না, উল্টে ইজরায়েল জিতেছে বারবার।

মরুময় ও পর্বতসঙ্কুল ইজরায়েল আজ শস্য-শ্যামলা সোনার দেশ। ইহুদিরা জানত, চিরশত্রু মুসলমানরা তাদের ছেড়ে কথা বলবে না। সুযোগ পেলে তাদের ধ্বংস করে দেবে চিরতরে। তাই মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচতে ইজরায়েলে সামরিক শিক্ষা আবশ্যিক। প্রতিটি ইজরায়েলি যেন এক একটি সৈনিক। জন্মভূমি রক্ষার্থে প্রায় ৭০ লক্ষ ইজরায়েলি আজ প্রস্তুত। ইজরায়েলে মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য। উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় ইজরায়েল গড়ে তুলেছে এক বিশাল আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের ভাণ্ডার। সে যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করছে বিভিন্ন দেশে, এমনকী ভারতেও। বিশ্বের ৭/৮ শক্তিশালী রাষ্ট্রের মধ্যে ইজরায়েল একটি এবং পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে সামরিক শক্তিতেও প্রথম স্থানে রয়েছে। ফিলিস্তিনি আগ্রাসন প্রতিহত করতে ইজরায়েল চালিয়েছে 'সার্জিকাল স্ট্রাইক'।

প্রধানমন্ত্রী মোদী এভাবেই ইজরায়েলের দেখানো পথে প্রত্যাঘাতের কথাই বলেছেন। সত্যি বলতে কী, ইজরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর সে ছিল ভারতের কাছে ব্রাত্য। কারণ ভারতের তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের দৃষ্টিতে ইজরায়েল ছিল মুসলমান বিরোধী। আরবের মুসলমান দেশগুলিকে খুশি রাখতে এবং দেশের মুসলমান ভোটে দাঁও মারতে ভারত ইজরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেনি। অথচ কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদ দমনে সে সাহায্য করতে চেয়েছিল। কিন্তু সরকার সেই সাহায্য নেয়নি সাম্প্রদায়িকতার অজুহাত তুলে। পরিণতিতে কাশ্মীর আজ হিন্দুশূন্য এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী ও উগ্রবাদীদের অভয়ারণ্য। নরসীমা রাওয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বকালেই ইজরায়েলের সঙ্গে হয় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন। তবে মোদী সরকারের সময় সেই সম্পর্ক হয়েছে দৃঢ়। ইজরায়েল আজ ভারতের বিশ্বস্ত বন্ধু।

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যানী, নদীয়া

সংসদ ভণ্ডুল করা বরদাস্ত করা যায় না

রাজনৈতিক দলগুলির বিভিন্ন দাবিদাওয়া বা রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য বন্‌ধ যেমন দেশ তথা জনসাধারণের উন্নয়নের পরিপন্থী, তেমনই সংসদের কাজকে ভন্ডুল করা কোনো ভাবেই বরদাস্ত করা যায় না। বিগত ১৭ দিন যাবৎ বিজেপির বিরোধিতা করার জন্যে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসসহ সমস্ত অ-বিজেপি রাজনৈতিক দলগুলি লোকসভা ও রাজ্যসভার কোনো কাজেই করতে দিচ্ছে না। অথচ জনসাধারণের প্রতিনিধি এবং জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে তারা রাজ্যসভা ও লোকসভার সদস্য হন। কিন্তু প্রত্যেক সদস্যই তাদের নিজেদের অস্তিত্ব খুইয়ে পার্টির হাইকমান্ডের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তাদের মেরুদণ্ড বলে কিছু নেই। ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে পদ চলে যাওয়ার ভয়ে হাইকমান্ডের কথায় সায় দেওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা ও লোকসভার সদস্যদের অভিনয় উপভোগ করার মতো। নোট বাতিল প্রসঙ্গটি যখন সারাদেশে ৮০ শতাংশ মানুষ সমর্থন জানাচ্ছে, সেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গ করছেন। শুধু তাই নয়, তিনি প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করারও উপদেশ দিয়েছেন।

আসলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে সারা বিশ্ব বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত করলেও মমতা তাতে ভিন্নমত পোষণ করেন। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, মমতা রাজনীতির জন্য দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত, কিন্তু নোট বাতিলের ভালো সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে রাজী নয়। এটা একপ্রকার রাজনৈতিক বিকার। তাই তিনি যেমন প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলেছেন তেমনি স্বাস্থ্যব্যাবস্থায় দুর্নীতি এবং নারী ও শিশু পাচারের স্বর্গরাজ্য বানানো পচিমবঙ্গকে কলুষমুক্ত করতে মমতা ব্যানার্জীর অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করা উচিত।

—এম. এম সিংহ,
ডুমুরজলা, হাওড়া।

নোট বাতিলের পরের দিনগুলি

নোট বাতিলের পর দুই মাস অতিক্রান্ত। ইতিমধ্যে পুরোনো নোট সাধরণ ব্যাংকে জমা করার সময়ও অতিক্রান্ত। ভারতের অর্থনীতিতে এ এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা। এই সময় বিরোধী কিছু রাজনৈতিক দল অহেতুক নোট বাতিলের বিরোধিতায় নামে। যদিও জনগণকে সাথে না পাওয়ায় সংসদ, বিধায়ক বা নেতাদের নিয়েই তাদের দল ভারী করতে হয়। আর নোট বাতিলের সবথেকে বিরোধিতা করে আমাদের রাজ্যের শাসকদল। কেউ আবার এই আন্দোলনকে ভর করে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নও দেখেছেন। কিন্তু দুই সাংসদের দলের দিল্লির ক্ষমতা দখলের পুনরাবৃত্তির স্বপ্ন যদি কেউ দেখেন তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করেন। নোট বাতিলের পর নাকি একাশি হাজার চাকরি গিয়েছে। কিন্তু কাদের চাকরি গেলো। দু তিনটে নাম কি কেউ বলতে পারবেন? মাইনে পাননি এমন কেউ আছেন কি? টাকার অভাবে কেউ বাজার করতে পারেননি এমন কেউ সত্যিই আছেন কি? আর চা বাগানের কথা কেউ কেউ বলছেন কিন্তু চা বাগানের সমস্যা কি নোট বাতিলের পরে তৈরি হয়েছে? আগে কি চা বাগান খুব ভালো ছিলো? আর অনেকে প্রতিহিংসার রাজনীতির কথা বলছেন, কিন্তু এতো বিরোধীদল থাকতে সেই দলের প্রতিই প্রতিহিংসা কেন থাকবে যেখানে তাদের রাজ্যের দুটো লোকসভা আসন পেলেও দিল্লিতে সরকার গড়া যায়? আর তারাই তো এক সময় সব ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে দাবি করতেন।

—রাহুল চক্রবর্তী,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

কাটোয়ায় দম্পতি মিলন অনুষ্ঠান

গত ৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাটোয়া জেলায় পরিবার প্রবোধনের উদ্যোগে বরেয়ায় ৩৫ দম্পতি-সহ ৮৯ জন এবং ৬ জানুয়ারি বিশ্বরম্ভায় ৫০ দম্পতি-সহ ১২৫ জন দম্পতি মিলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ভোলাডাঙ্গাতে অনুরূপ অনুষ্ঠান হয়। তিনটি স্থানেই দম্পতিরা সহভোজে অংশগ্রহণ করেন। তিন স্থানেই উপস্থিত ছিলেন পরিবার প্রবোধনের প্রান্ত প্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্র ও প্রান্ত টোলির সদস্য বিনয়ভূষণ দাস।

শ্রদ্ধানিধি

গত ১০ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বসিরহাট জেলার ন্যাজাট খণ্ডের কার্যকর্তা সুশান্ত সরকারের পিতৃশ্রাদ্ধে তাঁর মাতৃদেবী শ্রদ্ধানিধি অর্পণ করেন জেলা সঙ্ঘচালক সুকুমার বৈদ্যের হাতে। শ্রদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রচারক তাপস গড়াই-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক। শ্রাদ্ধবাসরে শ্রদ্ধানিধির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন পরিবার প্রবোধনের প্রান্ত প্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্র।

মঙ্গলনিধি

মালদা জেলার শিবাজীনগর শাখার স্বয়ংসেবক রামপ্রকাশ সাহার শুভবিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন তাঁর মাতৃদেবী জেলা প্রচারক মলয় দত্তের হাতে। অনুষ্ঠানে জেলা সহ ব্যবস্থা প্রমুখ জয়দেব সাহা-সহ বহু স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

পরলোকে গজেন্দ্রনাথ কুণ্ডু

মেদিনীপুরে সঙ্ঘকার্যের প্রতিষ্ঠাতা গজেন্দ্রনাথ কুণ্ডু গত ১০ জানুয়ারি সকাল ৮.৫৮ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। রেখে গেছেন ৭৮ বছর বয়স্কা সহধর্মিণী শ্রীমতী ভারতী কুণ্ডুকে। পূর্বেই তাঁর প্রয়াত দুই ভাই জিতেন্দ্র নাথ কুণ্ডু ও সত্যেন্দ্রনাথ কুণ্ডু সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ছিলেন।

মেদিনীপুরের বল্লভপুরে তাঁর বাসভবন

সঙ্ঘকার্যের প্রাণকেন্দ্র। বিদ্যাভারতী তথা সরস্বতী শিশু মন্দির, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের শুভারম্ভ হয়েছিল তাঁরই হাতে। পূজনীয় শ্রীগুরুজী তাঁর বাড়িতে দু'বার এসেছিলেন। পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডিতে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের জন্য তিনি ভূমি দান করেন এবং তাঁর বাসভবনটিও তিনি মেদিনীপুর শিক্ষা ও সেবা ভারতী ট্রাস্টকে দান করে গেছেন। শিশু মন্দিরের জন্য বহু দান করেছেন। এক কথায় তাঁর সমস্ত সম্পদই তিনি সঙ্ঘকাজে দান করে দিয়েছেন।

তিনি একজন নীরব দাতা, নিষ্ঠাবান কর্মী, নিরহঙ্কার মানুষ ছিলেন। তাঁর বাসভবন সকল স্বয়ংসেবক ও প্রচারকদের আপন গৃহের মতো।

স্বামীজীর জন্মদিনে শোভাযাত্রায় শিশুমন্দিরের ভাই-বোনেরা।

শব্দরূপ-৮১৯ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

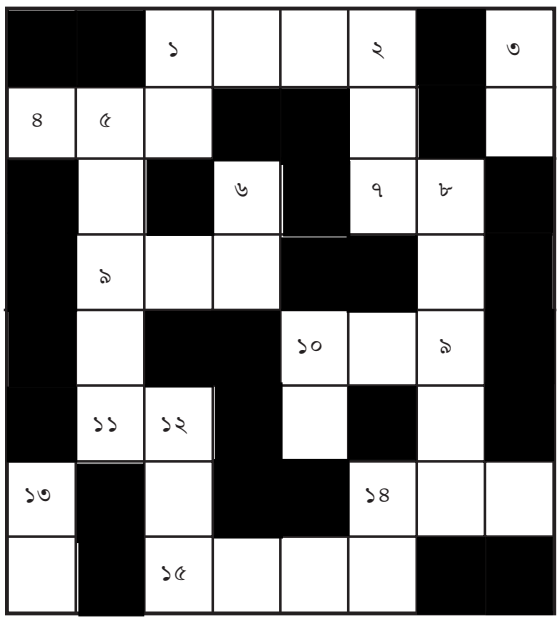

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. রামচরিত্রাভিনয়, **৪.** দুই দলের প্রতিযোগিতামূলক গান বিশেষ (কবির লড়াই জাতীয়), **৭.** রাধিকার সখীবিশেষ, **৯.** কামধেনু, **১০.** ধৃষ্টতা, স্পর্ধা, **১১.** মধ্যযুগীয় ভারতের এক বিশিষ্ট অতীন্দ্রিয়বাদী কবি ও সন্ত—এঁর 'দোঁহা' বিখ্যাত, **১৩.** সর্পের দেবী, **১৪.** গণেশ।

উপর-নীচ : ১. 'চাই না মাগো — হতে', **২.** দাবিত্যাগ, **৩.** দুর্গের চতুর্দিকের খাত; গড়খাই, **৫.** বিখ্যাত রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য, **৬.** সমুদ্রতীর, সৈকত, **৮.** অভিশাপ মুক্তি; রবীন্দ্র-নাটক, **১০.** আইনের বিধি; ওল্টালে কৃষ্ণের প্রিয়া, **১১.** মস্তকহীন দেহ, **১২.** আম, **১৩.** মরণশীল।

সমাধান
শব্দরূপ-৮১৬
সঠিক উত্তরদাতা

সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬
শিবেন হালদার
ভাঙাটোলা, মালদা

অ	ম্বা	লি	কা		ম	শ	ক
		ঙ্গা		কৃ		ত	
চা		য়ে		ক	ল্ল	দ্রু	ম
ল	লি	ত	ক	লা			ছ
বা			রা	স	ম	ণ্ড	ল
জ	লা	শ	য়		নে		ন্দ
	ঙ্গু		ত্ত		ম		
চা	ল	শে		স্থা	নে	শ্ব	র

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৮১৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

সংস্কৃত ধাতু থেকে উৎপন্ন শব্দ প্রথম প্রথম অপরিচিত ও কঠিন মনে হলেও পরে ধীরে ধীরে সহজবোধ্য হয়ে সূক্ষ্ম ও যথার্থভাব ব্যক্ত করা যায়। সংস্কৃত ভিত্তিক পারিভাষিক শব্দাবলী শুধু ভারতের জন্যই উপযোগী নয়, বরং সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য উপযোগী হতে পারে এবং আগামীদিনে তা অন্তর্রাষ্ট্রীয় শব্দাবলীরূপে প্রকাশিত হবে।

* * *

লিপির প্রশ্নও সমস্যাময়। গুরুমুখীর বিরোধিতার মধ্যে কোনো সারবত্তা নেই। পঞ্জাবিভাষী জনতা ব্যাপকভাবে এই ভাষা ব্যবহার করেন। কিন্তু এমন লোকও বহু আছেন যাঁরা নাগরি লিপি ব্যবহারের দাবি করেন। এতে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে যে, পঞ্জাবি ভাষার জন্য নাগরি লিপি প্রয়োগ করা হলে পঞ্জাবিভাষা বিকশিত হতে পারবে না। কিন্তু এই আশঙ্কা অমূলক। মারাঠি লিপি নাগরি কিন্তু ভাষা আলাদা। পঞ্জাবে নাগরি লিপির ব্যবহার হলে প্রকাশিত পুস্তক নিশ্চিতরূপে বড় বাজার পাবে। শুধু গুরুমুখীর দাবি করলে পঞ্জাবিদের ক্ষেত্র সীমিত হয়ে পড়বে।

* * *

হিন্দির বিষয়ে বহু লোকই একমত। কিন্তু সরকারি নীতির ফলে বিবাদ উৎপন্ন হয়েছে। এখন পর্যন্ত সরকার সারা দেশে একই পারিভাষিক শব্দ কেন তৈরি করেনি? রাজাজী কি বাধা দিয়েছিলেন? অসলে বাধা হিন্দি বিরোধীদের নয়; সরকারের উপেক্ষা ও উদাসীনতাই এর জন্য দায়ী।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ১৯

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬, দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

নতুন বছরে দত্তক নেওয়ার নতুন নিয়ম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ নতুন বছরের শুরুতেই সেন্ট্রাল অ্যাডপশন রিসোর্স অথরিটি (সিএআরএ) দত্তক সন্তান গ্রহণ করার নিয়মকানুন ঢেলে সাজাল। দত্তক গ্রহণের পূর্বতন নিয়মাবলী সংশোধন করে নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন দত্তক এজেন্সি এবং দত্তক গ্রহণে ইচ্ছুক বাবা-মায়েদের সমস্যার সমাধানই এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য। নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের এক আধিকারিক এই প্রসঙ্গে বলেন, 'মন্ত্রকের এই পদক্ষেপে দেশে দত্তক গ্রহণ কর্মসূচি আরও শক্তিশালী এবং সুসংহত হবে।' মন্ত্রকের প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গেছে, এখন থেকে যেসব ভারতীয় নাগরিক দম্পতি দত্তক গ্রহণ করতে চান তাঁরা শিশু নির্বাচন করার পর পাকাপাকি ভাবে দত্তক নেওয়ার আগে ২০ দিন সময় পাবেন। এর আগে এই সময় ছিল ১৫ দিনের। নতুন নিয়মে ৩২ টি শিডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মন্ত্রকের ওয়েবসাইটেই দত্তক গ্রহণের নিয়মাবলী এবং ফর্ম পাওয়া যাবে। কেউ চাইলে অনলাইনে আবেদনও পূরণ করে সরাসরি আদালতের শিলমোহরের জন্য দাখিল করতে পারেন। নতুন নিয়মে পেশাদার সমাজ সেবকেরা জেলা শিশু সুরক্ষা কেন্দ্রের অধীনে থেকে এই কর্মসূচি রূপায়ণে সক্রিয় ভূমিকা নেবেন। নতুন নিয়মের ফলে আরও বেশি স্বচ্ছতা আসবে বলে মনে করছে নারী ও শিশুবিকাশ মন্ত্রক।

অশিষ্টতার জন্য অ্যামাজনকে তীব্র ভর্ৎসনা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারতের জাতীয় পতাকা অঙ্কিত পাপোশ বিক্রি করার জন্য কিছুদিন আগে বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ আমাজনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে। সম্প্রতি অর্থমন্ত্রকের সচিব শক্তিকান্ত দাসও বিশ্বখ্যাত অনলাইন বাণিজ্যসংস্থা অ্যামাজনকে ভদ্র ব্যবহার করার এবং 'ভারতীয় পরম্পরায় শ্রদ্ধেয় প্রতীক ও নিদর্শনগুলির প্রতি শিষ্টাচার-বহির্ভূত প্রগলভতা পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। একটি টুইট বার্তায় তিনি বলেন, 'অ্যামাজনের উচিত ভদ্র ব্যবহার করা। ভারতের অধিবাসীদের আদরের প্রতীক ও নিদর্শনগুলির প্রতি অসম্মানজনক আচরণ কখনই তাদের কাছে কাম্য নয়। অ্যামাজন যদি এখনও বিরত না হয় তাহলে নিজের বিপদ তারা নিজেরাই ডেকে আনবে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ জাতীয় পতাকা অঙ্কিত পাপোশ বিক্রি করার জন্য অ্যামাজনকে নিঃশর্তে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বলেন এবং সেইসঙ্গে সমস্ত অবিক্রিত পণ্য অবিলম্বে বাজার থেকে তুলে নিতে বলেন। নির্দেশ অমান্য করা হলে অ্যামাজনের কোনও আধিকারিক ভবিষ্যতে ভারতের ভিসা পাবেন না এবং যারা বর্তমানে ভারতে রয়েছেন তাদের ভিসাও বাতিল করা হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন। সরকারি সূত্র অনুযায়ী অ্যামাজন জাতীয় পতাকা-অঙ্কিত পাপোশ তাদের অনলাইন পোর্টাল থেকে তুলে নিয়েছে। আমাজন ইন্ডিয়ার ভাইস চেয়ারম্যান এবং কান্ট্রি ম্যানেজার অমিত আগরওয়াল চিঠি দিয়ে 'ভারতীয়দের আবেগে আঘাত করার জন্য দুঃখপ্রকাশও করেছেন।

দেশের ৪০০ থানায় ফোন নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দিন-দিন অপরাধ যেমন বাড়ছে, সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পুলিশের ওপর নির্ভরতা। কিন্তু যথার্থ পরিষেবা দেবার মতো ন্যূনতম পরিকাঠামো পুলিশের আছে কিনা সে বিষয়ে কারও হেলদোল নেই। বুরো অব পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের একটি সমীক্ষায় জানা গেছে দেশের ১৮৮টি থানায় কোনও গাড়ি নেই, ৪০২ টি থানায় ফোন নেই, ১৩৪ টিতে ওয়ারলেস সেট নেই এবং ১৩৪টি থানায় টেলিফোন ওয়ারলেস কিছুই নেই। শুধু মণিপুরেই এরকম ৪৩টি থানা রয়েছে যেখানে ফোন বা ওয়ারলেস কিছুই নেই। ছত্তিশগড়ের ১৬১ টি থানার নিজস্ব গাড়ি নেই। মধ্যপ্রদেশের ১১১টি থানায় ফোন নেই। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক আধিকারিকের কথায় উঠে এসেছে এই পরিকাঠামোগত অসুবিধা। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশকে যে পরিকাঠামোগত নানান অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয় তা স্বীকার করে তিনি জানান রাজ্য সরকারগুলির সহায়তায় কেন্দ্র যতশীঘ্র সম্ভব পরিকাঠামোর উন্নয়নে বদ্ধপরিকর।

সিন্ধু এবং করাচির জন্য আদবাণীর আক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দেশভাগের ফলে সিন্ধুপ্রদেশ এবং তার রাজধানী করাচী ভারতের হাতছাড়া হওয়ায় ভারতীয় জনতা পার্টির বর্ষীয়াণ নেতা লালকৃষ্ণ আদবাণী সম্প্রতি রীতিমতো আক্ষেপ করেছেন। তাঁর মতে সিন্ধু প্রদেশ এবং করাচী ছাড়া ভারত অসম্পূর্ণ। তিনি বলেন, মাঝে মাঝে আমার বেশ মন খারাপ হয়ে যায়। বিশেষ করে যখন ভাবি করাচী আর সিন্ধু ভারতের অঙ্গ নয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, সিন্ধুপ্রদেশে আমার জন্ম। ছেলেবেলা থেকেই আমি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের যুক্ত। সেইসব দিনের কথা ভাবলে খুব হতাশ লাগে। মনে হয় সিন্ধুপ্রদেশকে বাদ দিয়ে ভারতের পক্ষে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
23 January - 2017 - Rs. 10.00,

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com।। দাম ১০ টাকা।।